Semester – IV

Paper – C-8 (Modern Western Political Thought)

Unit – 1 : Thomas Hobbes : Materialism
বস্তুবাদী রাজনীতি
Human nature : মানুষের প্রকৃতি
Sovereignty : সার্বভৌমত্ব ॥

Scanned with CamScanner

টমাস হবস্ : ১৫৮৮-১৬৭৯ (Thomas Hobbes : 1588-1679)

প্রস্তাবনা : সামাজিক চুক্তি মতবাদের (Social Contract Theory) অন্যতম সার্থক প্রবক্তা হিসাবে ইংরাজ রাষ্ট্রদার্শনিক টমাস হবস্ (Thomas Hobbes : 1588-1679) রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের মাধ্যমেই তিনি তদানীন্তন ইংলণ্ডের বিশৃঙ্খল ও স্বৈরাচারী রাজনৈতিক-প্রশাসনিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকেই (Absolute Monarchy) একমাত্র কাম্য শাসনব্যবস্থা বলে মনে করছেন। তিনি মনে করতেন, সার্বভৌম রাজার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনেই সুষ্ঠ প্রশাসন পরিচালিত হতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা সুরক্ষিত হতে পারে। তাই তিনি তাঁর প্রচারিত সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের মাধ্যমে চরম সার্বভৌমত্বের ধারণাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন, যা' পরবর্তীকালের সুদৃঢ় 'জাতীয় রাষ্ট্র' গঠনের হাতিয়ার হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে; এবং এই কারণেই তিনি রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে শ্রদ্ধাস্পদ আসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছেন। ম্যাক্সে উচ্ছ্বসিতভাবে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "The influence of Hobbes was quite perceptible in 19th Century legal thought" (Maxey, *Political Philosophies*, p. 234.

সংহতি সাধনকারী রাষ্ট্র-দর্শনের জন্যই হবস্ রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এক শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিত্ব

১। হবস্ ও সমকালীন পরিস্থিতি (Hobbes and Contemporary Situation) :

বলাই বাহুল্য, হবসের রাষ্ট্রদর্শন ছিল সমকালীন ব্রিটিশ সমাজ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। মূলতঃ সমকালীন ব্রিটিশ সমাজের সীমাহীন বিশৃঙ্খলাই তাঁকে ১৬৫১ সালে **লেভিয়াথান** (*Leviathan*) গ্রন্থটি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৫৮৮ সালে স্পেনীয় নৌবাহিনীর ভয়ঙ্কর অভিযানের ভয়াবহ পরিস্থিতির সময়ে হবস্ মাম্‌স্‌বারি বা Malmsbury অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন ; এবং জন্ম থেকেই তিনি ভীতিপ্রদ ও অস্থির সমাজ-রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অস্থির ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিই তাঁকে শৃঙ্খলাবিধানকারী ও নিয়মানুবর্তী সমাজ জীবনের রাষ্ট্রদর্শন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই একথা যথার্থই বলা হয়ে থাকে, "Hobbes was the first great philosopher of discipline."

রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য হবস্ তার রাষ্ট্রদর্শন গড়ে তোলেন

বস্তুতপক্ষে হবসের সমকালীন ইংলণ্ডের সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্যই ছিল বিভিন্ন রাজার উত্থান ও পতন এবং সীমাহীন বিশৃঙ্খলা, সংঘর্ষ, নৈরাজ্য ও স্বার্থদ্বন্দ্ব। তাই দেখা যায় ১৬০৩ সালে প্রথম এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে প্রথম জেমস্ রাজপদে বৃত হন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রথম চার্লস সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু রাজার পর রাজা সিংহাসনে

Scanned with CamScanner

আরোহন করলেও জনস্বার্থ কিন্তু উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছিল। রাজারা প্রজাদের কল্যাণসাধনের পরিবর্তে বিদেশের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ করতেই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। ফলে রাজকোষ সহজেই শূন্য হয়ে পড়ত। এবং রাজকোষ পূর্ণ করে তোলার জন্য প্রজাদের সংগতি ও সামর্থ্যকে বিবেচনা না ক'রেই তাদের উপর মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব আরোপ করা হ'ত। এমত অবস্থায় রাজা বনাম প্রজার বিরোধ চূড়ান্ত হয়ে উঠত। রাজা প্রজার বিরোধে পার্লামেন্ট প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করত এবং পার্লামেন্টের সদস্যগণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে তাদের পরামর্শ ব্যতীত রাজাকে নতুন রাজস্ব বা কর আরোপ করতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে পার্লামেন্টের সাথেও রাজার বিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই বিরোধের ক্ষেত্রে রাজশক্তির প্রাধান্যকে বজায় রাখার জন্য রাজা বেপরোয়াভাবে স্বৈরাচারিতার পথ অনুসরণ করতেন। রাজকীয় স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারিতার ফলে ইংলণ্ডে সীমাহীন নৈরাজ্য ও অশান্তি ঘনীভূত হয়েছিল। ফলে, সাধারণ জনজীবন নৈরাশ্য ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিল। এমত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের সমাজ রাজনৈতিক জীবনে সুস্থিরতা, শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনের মহান লক্ষ্যেই হবস্ তাঁর রাষ্ট্রদর্শন গড়ে তোলেন এবং সামাজিক চুক্তি-তত্ত্বের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধীনে রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বক্তব্য পেশ করেন।

সমকালীন ইংলণ্ডের নৈরাজ্য ও রাজকীয় শোষণে হবস্ ছিলেন অত্যন্ত ব্যথিত

নৈরাশ্য ও বিশৃঙ্খলা দুর করতেই রচিত হয় হবসের শৃঙ্খলাকামী চুক্তিবাদী রাষ্ট্রদর্শন

রাজকীয় স্বেচ্ছাচারিতা-প্রসূত ইংলণ্ডের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকে দূর করার জন্যই হবস্ ***Leviathan*** গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তিনি এই গ্রন্থে চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন 'নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রেরই' (Absolute Monarchy) জয়গান গেয়েছিলেন। ফলে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে জনগণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক প্রবণতার আভাস পাওয়া যায় না, যদিও তিনি প্রজাদের স্বার্থে রাজার দায়িত্বশীলতাকে অবশ্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলা হয়ে থাকে যে, "Hobbes' importance lies in his "deriving logically from a mass of free and equal individuals the concept of omnipotent state".

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অধীনে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ও হবস্

২। হবস্ ও সামাজিক চুক্তি (Hobbes and Social Contract) :

হবস্ ও সামাজিক চুক্তির মূল বক্তব্য : সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম সার্থক প্রবক্তা হলেন টমাস হবস্ (Thomas Hobbes)। তিনি মনে করেন সমাজ গঠিত হওয়ার আগে মানুষ প্রকৃতির কোলে জীবন যাপন করত। কিন্তু এই প্রকৃতি রাজ্য ছিল দুর্বিষহ। মানুষেরা সেই সময় সর্বদাই পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত থাকত। সেখানে কোন সুখ-শান্তি ছিল না এবং মানুষের জীবন ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। হবস্ মনে করেন প্রকৃতি রাজ্যের এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষেরা চুক্তি—যা হল সামাজিক চুক্তি তা'—সম্পাদন ক'রে সমাজ গড়ে তুলল এবং সমাজের শাসকের হাতে তাদের সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার সমর্পণ করল। এই শাসকই হলেন সার্বভৌম। তার সর্বময় ক্ষমতার

প্রকৃতি রাজ্যের দুর্বিষহ জীবনের হাত থেকে মুক্তিকল্পে চুক্তি সম্পাদন ক'রে সমাজ গঠন

Scanned with CamScanner

অধীনেই মানুষেরা সুস্থ জীবনের নিরাপত্তা লাভ করল। সংক্ষেপে এটুকুই হল হবস্ বর্ণিত সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের সার কথা।

প্রকৃতির রাজ্য ঃ হবসের সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রকৃতি রাজ্য (State of Nature) সংক্রান্ত তাঁর ধারণা। হবস্ মনে করতেন প্রাক্ সামাজিক যুগে মানুষেরা প্রকৃতি রাজ্যে বাস করত। কিন্তু এই প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভয়াবহ ও অসহনীয়। প্রকৃতি রাজ্যে মানুষেরা সর্বদাই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। তারা একে অপরকে অবিশ্বাস করত এবং এই অবিশ্বাসের কারণে তাদের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। বলশালী ব্যক্তিরা অবলীলায় দুর্বল ব্যক্তিদের হত্যা করত। ফলে মানুষের জীবন তখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। তখন প্রতিযোগিতা, উদাসীনতা ও উপেক্ষা এবং অহমিকার পাপের দ্বারা মানুষের জীবন চিহ্নিত হয়েছিল। এর ফলে প্রকৃতি রাজ্য হয়ে উঠেছিল এক ধারাবাহিক সংঘাতের রাজ্য। হবসের মতে, It was a state of perpetual war of "every man against every man" and there was only "force and fraud" (Hobbes, ***Leviathan,*** Chap–XIII)। তাই তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছেন, তখন মানুষের জীবন ছিল "Poor, Solitary, nasty, brutish and short' বা 'হতভাগ্য, নিঃসঙ্গ, জঘন্য, পাশবিক ও সংক্ষিপ্ত।'

রণক্ষেত্র স্বরূপ প্রকৃতি রাজ্যে মানুষের দুর্বিষহ জীবন

প্রকৃতির রাজ্য ঃ প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার ঃ হবস্ অবশ্য মনে করেন যে প্রকৃতি রাজ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্ব-দীর্ণ ও সংঘাতপূর্ণ অনিশ্চিত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজ করত প্রাকৃতিক আইন বা Law of Nature. তাঁর মতে 'প্রাকৃতিক আইন' হল আত্মসংরক্ষণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুনের সমষ্টি। এই নিয়ম-কানুনগুলিই মানুষকে নিজের শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা তথা আত্ম-সংরক্ষণের (Self-preservation) জন্য যে কোন যুক্তিসংগত ও বুদ্ধিসাপেক্ষ কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছিল। তাই প্রাকৃতিক আইন আত্ম-সংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ সম্পাদন করা থেকে মানুষকে বিরত করত ও নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু হবস্ মনে করেন যে, প্রাকৃতিক আইন প্রকৃতি রাজ্যের সকল মানুষের জীবনকে সার্বিক সংরক্ষণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করলেও তদানীন্তন মানুষেরা কিন্তু নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করতনা, বরং যাপন করত অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খল জীবন। এর মূল কারণ ছিল এই যে, তখন মানুষেরা প্রাকৃতিক অধিকারের (Rights of Nature) কাছ থেকে আত্ম-সংরক্ষণের স্বার্থে অবাধ কর্মপ্রয়াসের সুযোগ লাভ করেছিল।

প্রকৃতি রাজ্যে মানুষ প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের দ্বারা পরিচালিত হত

হবসের মতে প্রাকৃতিক অধিকার হল আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজনে ব্যক্তির যে কোন কাজের, এমনকি বিশ্বাসঘাতকতা মূলক, নাশকতাসূচক অথবা ষড়যন্ত্রমূলক কাজেরই স্বাধীনতা। ফলে প্রাকৃতিক অধিকারের আত্ম-সংরক্ষণমূলক অবাধ কর্মপ্রয়াসের সুযোগ নিয়ে প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের সুখ-সমৃদ্ধি, ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য পারস্পরিক বিবাদে সর্বদাই লিপ্ত থাকত।

হবসের মতে প্রাকৃতিক অধিকারের প্রকৃতি

Scanned with CamScanner

হবস্ প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, এরা উভয়েই ব্যক্তির আত্ম-সংরক্ষণের উপায়। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন যেখানে প্রকৃতির যুক্তি-বুদ্ধির ফলশ্রুতি বলে তা'ইল সংহতিমূলক উপায়, সেখানে প্রাকৃতিক অধিকার ব্যক্তির নিজের স্বার্থ-বুদ্ধি ও আত্মস্বার্থের যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা'ইল সংহতি-বিনাশী ধ্বংসমূলক উপায়। আর মানুষ তার প্রকৃতিগত দিক থেকে ক্ষমতালিপ্সু ও হিংসাপ্রবণ বলেই সে প্রাকৃতিক অধিকারের সুযোগ নিয়ে আত্ম-সংরক্ষণ ও আত্ম-সুখ-শান্তির জন্য অপরের সাথে ধারাবাহিক কলহ-বিবাদে মেতে উঠল এবং আপন ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তারে সর্বদায় সচেষ্ট হয়ে উঠল। ফলে প্রাকৃতিক অধিকারের কারণেই প্রকৃতি রাজ্য মানুষজনের ধারাবাহিক সংঘর্ষের রাজ্যে পরিণত হল এবং মানুষের জীবন হয়ে উঠল অনিশ্চিত ও আতঙ্কময়।

প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার উভয়েই আত্ম-সংরক্ষণের উপায় হলেও প্রাকৃতিক অধিকার ভোগকে কেন্দ্র করেই প্রকৃতি রাজ্যে চূড়ান্ত বিরোধ দেখা দিল

প্রকৃতির রাজ্য ও সামাজিক চুক্তি : প্রকৃতি রাজ্যের এই রকম দুর্বিষহ জীবনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই মানুষেরা এক সুষ্ঠু সমাজের প্রয়োজন বোধ করল, যে সমাজ তাদের আইনগত ও প্রশাসনিক দিক থেকে সুরক্ষা করবে। এবং এই জন্যই প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন ক'রে সমাজ গঠন করল এবং নিজেদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমাজের শাসকের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা তুলে দিল। হব্‌সের মতে, এই চুক্তিই হল সামাজিক চুক্তি বা Social Contract.

প্রকৃতি রাজ্যের দুর্বিষহ জীবনের হাত থেকে মুক্তির জন্যই সামাজিক চুক্তি

হবস্ মনে করেন, সুস্থ জীবনের স্বার্থে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা 'সামাজিক চুক্তি' সম্পাদন ক'রে সুসংহত সমাজ বা রাষ্ট্র (Commonwealth) গড়ে তুলল এবং গড়ে তুলল এর সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ, যে কর্তৃপক্ষ তাদের জীবনের শান্তি, সংহতি ও সুস্থ অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিল। এ প্রসঙ্গে হবস্ বলেন, "A Commonwealth is said to be instituted when a multitude of men do agree and covenant, every one with every one, that to whatever man or assembly of men shall be given by the major part the right to present the person of them all, that is to say, to be their representative....." (Hobbes, ***Leviathan***, Chapter-XIII) অর্থাৎ প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা পারস্পরিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন ক'রে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের অধীনে সুসংহত সমাজ গঠন করল এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে লাগল।

সুস্থ জীবনের স্বার্থে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সুসংহত সমাজ গঠন

সামাজিক চুক্তি ও তার প্রকৃতি : কিন্তু প্রশ্ন হল : দুর্বিষহ ও শত্রুতাপূর্ণ প্রকৃতি রাজ্যের ক্ষমতালিপ্সু উচ্ছৃঙ্খল ও স্বার্থপর মানুষেরা কেন 'সামাজিক চুক্তি' সম্পাদন করল?

এই প্রশ্নের উত্তরে হব্‌সের বক্তব্য হল : আসলে প্রকৃতিগতভাবে চূড়ান্ত স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু মানুষেরা দুর্বিষহ প্রকৃতি রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ ও ধারাবাহিক বিরোধের পরিস্থিতিকেই ভবিষ্যতেও বজায় রেখে চলত। কিন্তু দু'টি বিষয় তাদের এই কাজ করতে

Scanned with CamScanner

বাধা দিয়েছে। একটি হল মানুষের 'যুক্তি' (reason) এবং অপরটি হল 'সহিংস ও বীভৎস মৃত্যুর ভীতি' (fear of violent death)। মানুষের অন্তর্নিহিত 'যুক্তিই' তাকে এই সত্য উপলব্ধি করিয়েছিল যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের চেয়ে শান্তিই অধিকতর কাম্য, যেহেতু শান্তিই কষ্টকে কমিয়ে সুখকেই অধিক ত্বরান্বিত করে। তাছাড়া সহিংস মৃত্যুর ভীতিই মানুষের আবেগকে তার অন্তর্নিহিত এই শান্তিকামী যুক্তিরই অনুগামী করে তোলে।

মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তি ও বীভৎস মৃত্যুর ভীতিই মানুষকে চুক্তি সম্পাদনে অনুপ্রেরিত করেছিল

বস্তুতপক্ষে শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতি মানুষজনের এই স্বাভাবিক আগ্রহ ও আকুতিই তাদের একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে 'চুক্তি' স্বাক্ষর ক'রে সুসংহত সমাজ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং এই শান্তি ও সুস্থিতির আকুতিই এই চুক্তি প্রসূত সমাজের শাসন কর্তৃপক্ষ হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হাতে নিজেদের যাবতীয় অধিকার সমর্পণ ক'রে সার্বভৌম শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং তার মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রেরিত করেছিল।

শান্তি ও সুস্থিতির আগ্রহই চুক্তির উৎস

বস্তুতপক্ষে হবস্ এ'কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, শুধুমাত্র নিরাপদ অস্তিত্বের তাগিদেই প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা বাধ্য হয়ে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে 'সামাজিক চুক্তি' সম্পাদন করেছিল এবং ঐক্যবদ্ধ সমাজ বা Commonwealth গড়ে তুলেছিল। তাঁর মতে, বিশৃঙ্খল, বিপজ্জনক ও আতঙ্কময় প্রকৃতি রাজ্যে বসবাস করতে করতে মানুষেরা প্রতিমুহূর্তে নিজেদের অস্তিত্বের নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে থাকে। তাই তারা নিরাপদ জীবনের আশায় চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে নিজেদের সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার ও ক্ষমতা কোন একজন ব্যক্তি বা কোন একটি ব্যক্তি-সংস্থার হাতে সমর্পণ ক'রে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংস্থার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনে সুস্থ জীবন যাপনের অধিকারী হয়ে উঠল।

সুশৃঙ্খল জীবনের স্বার্থে চুক্তি ও সমাজ গঠন

মোটামুটিভাবে এটুকুই হল 'সামাজিক চুক্তি' সংক্রান্ত হব্‌সের ধারণার মর্মকথা।

সমালোচনা : সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত হব্‌সের বক্তব্য নানা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে থাকে, যথা—

(১) সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত হব্‌সের বক্তব্য মানুষের প্রকৃতির সঠিক চিত্র তুলে ধরেনা। হবস্ মানুষের প্রকৃতির শুধুমাত্র হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার ছবিই এঁকেছেন, অথচ মানুষের প্রকৃতির কোমলতা স্নেহ-প্রীতি ও নম্রতার কথা আদৌ বলেননি। তাই তাঁর বক্তব্য বাস্তবসম্মত নয়।

(২) সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত হব্‌সের বক্তব্য যুক্তির দিক থেকে অসম্ভব ধারণা মাত্র। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য অযৌক্তিক, কারণ এটা কোন যুক্তিতেই মেনে নেওয়া যায় না যে, হবস্ বর্ণিত প্রকৃতি রাজ্যের বন্য-হিংস্র-সংঘাতপ্রবণ-রুক্ষ-হৃদয়হীন মানুষেরা কোনও প্রকার চুক্তি সম্পাদন করার মতো যথার্থ যুক্তিপ্রবণ ও বিচারবোধসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে পারে এবং উন্নত আইনগত চেতনার অধিকারী হতে পারে।

(৩) সামাজিক চুক্তি বিষয়ক হব্‌সের বক্তব্য আইনগত ও বিচারগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে

Scanned with CamScanner

সম্পূর্ণ অবাস্তব ধারণা ; কারণ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত সমাজের আইনগত ও বিচার-বুদ্ধিগত সুশৃঙ্খল পরিবেশেই একমাত্র চুক্তি সম্পাদন করার যৌক্তিক মানসিকতা গড়ে উঠতে পারে, অন্যত্র তো নয়ই। তাই হিংস্র বিচার বুদ্ধিহীন ও আইনগত চেতনাবিহীন প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা চুক্তি সম্পাদন করেছিল—হব্‌সের এই বক্তব্য নিতান্তই অযৌক্তিক, অহেতুক ও অবাস্তব।

(৪) সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত ধারণায় হবস্ চুক্তি প্রসূত রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন লেভিয়াথানে পরিণত করেছেন। তাঁর মতে, এই কর্তৃপক্ষ চুক্তি সম্পাদনকারী কোনও পক্ষ নয় ; তাই এই কর্তৃপক্ষ চুক্তির উর্দ্ধে এবং অবাধ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন লেভিয়াথানে (Leviathan) পরিণত করতে গিয়ে হবস্ রাষ্ট্রীয় চরমতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং সামগ্রিকতাবাদী বা সর্বাত্মকতাবাদী (Totalitarian) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সাদরে বরণ ক'রে তার পদতলে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বলিদান করেছেন।

এই সমস্ত দিক থেকে লেভিয়াথান গ্রন্থে উল্লিখিত সামাজিক চুক্তি বিষয়ক হব্‌সের বক্তব্য কঠোরভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে।

মন্তব্য : সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত হব্‌সের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাধারার গুরুত্বকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতপক্ষে চুক্তি বিষয়ক হব্‌সের ধারণা রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর এই ধারণার মধ্য দিয়েই যুক্তিবাদের চিন্তাধারার সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ও নিয়মানুবর্তী সমাজ জীবনের ইতিকথা রচনা করেছেন। আইভর ব্রাউন (Ivor Brown) তাই তাঁকে 'the first philosopher of discipline' বা 'শৃঙ্খলা-নিমানুবর্তিতার প্রথম দার্শনিক' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপক স্যাবাইন (Sabine) তাই যথার্থই লিখেছেন, Hobbes' Political Philosophy "is chiefly notable for the logical clarity of the argument and consistency....." (G. H. Sabine, **A History of Political Theory**, Indian edition, 1973, p. 438) বস্তুতপক্ষে অধ্যাপক স্যাবাইনের এই সুগভীর বক্তব্যের মধ্যেই সামাজিক চুক্তি বিষয়ক হব্‌সের ধারণার সুনিবিড় তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রথম প্রকাশক হিসাবেই হব্‌সের সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ

৩। সার্বভৌমত্ব ও তার প্রকৃতি : হবস্ (Sovereignty and its Natrue : Hobbes) :

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে টমাস হবস্ এক পূর্ণাঙ্গ চিন্তাধারা উপস্থাপন করেছেন। তিনি মনে করতেন, সার্বভৌম ক্ষমতা হল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ও অবাধ ক্ষমতা। এই ক্ষমতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জন-জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করেন। এই চূড়ান্ত সার্বভৌমিকতার ধারণার মধ্য দিয়েই হবস্ রাষ্ট্রীয় সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

হবস্ : রাষ্ট্রীয় সংহতির উৎস হল সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক চুক্তি : সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত হব্‌সের চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে

Scanned with CamScanner

অনুধাবন করতে হলে সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যকভাবে জেনে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার আগে মানুষেরা প্রাকৃতিক রাজ্যে বাস করত। কিন্তু প্রকৃতি রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিরাপত্তাহীনতা, অনৈক্য প্রভৃতি কারণে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তাই তারা এই দুর্বিষহ জীবনের হাতে থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন ক'রে সমাজ গঠন করল এবং নিজেদের সকল ক্ষমতা সমর্পণ ক'রে সেই সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকার গঠন করল। প্রকৃতপক্ষে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারই হল হব্‌সের মতে প্রকৃত সার্বভৌম এবং এই সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতাই হল সার্বভৌম ক্ষমতা।

চুক্তি প্রসূত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বই হল সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব হল চুক্তির ফসল : হবস্ দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা শুধুমাত্র নিরাপত্তা ও সুস্থ জীবনের জন্যই চুক্তি ক'রে সমাজ ও রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সার্বভৌম ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল। তিনি 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে তাই সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, "I authorise and give up my right of governing myself to this man or to this assembly of men." অর্থাৎ হব্‌সের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকৃতিরাজ্যের মানুষেরই চুক্তির ফসল।

সার্বভৌমত্ব হল সামাজিক চুক্তির ফলশ্রুতি

সার্বভৌমত্বের লক্ষ্য : হবস্ মনে করতেন যে, প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা চূড়ান্ত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি ক'রে তার হাতে স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। তারা তা দিয়েছিল এই শর্তে যে, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ তাদের নিরাপত্তা ও জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করবে। হবস্ মনে করেন, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত ক্ষমতাকে প্রয়োগ ক'রে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করবে ও ব্যক্তির জীবনকে নিরাপদ করবে। তাঁর মতে, তরবারি ও আইনের সাহায্যে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ যদি বিশৃঙ্খলা দূর করতে না পারে, তা'হলে ব্যক্তির জীবন নিরাপদ হতে পারে না। তিনি বলেছেন, "Covenants without sword are but words and of no strength to secure a man at all." তাই ব্যক্তির জীবনকে নিরাপদ করার জন্য হবস্ মনে করেন, মানুষেরা চুক্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত ক্ষমতা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছিল।

নিরাপদ জীবনের শর্তে জনগণ চুক্তি করে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ গড়েছিল

সার্বভৌমত্ব ও জনজীবনের নিরাপত্তা : হবস্ দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতিরাজ্যের মানুষেরা গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তি করেনি ও সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে গড়ে তোলেনি। বরং তারা তা' করেছিল প্রকৃতি রাজ্যের বিশৃঙ্খলার হাত থেকে জীবনকে নিরাপদ করার জন্যই। তাই হবস্ মনে করেন যে, নিরাপদ জীবনের স্বার্থেই প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা চুক্তি করে চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে গড়ে তুলেছিল। এই নিরাপত্তারক্ষাকারী সার্বভৌম কর্তৃত্বকে গড়ে তোলার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে যাতে কোনো বিরোধ দেখা না দেয় সেইজন্য প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের সকলের মতামত গ্রহণ করার গণতান্ত্রিক

সুস্থ ও নিরাপদ জীবনের স্বার্থে সার্বভৌমত্ব

Scanned with CamScanner

রীতির প্রতি আস্থা দেখিয়েছিল। তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল সার্বভৌম কর্তৃত্ব গড়ে তুলে তার অধীনে সুস্থ ও নিরাপদ জীবন-যাপন করা।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ঃ হব্‌সের সার্বভৌমত্ব বিষয়ক ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যথা—

(১) **চুক্তিভিত্তিক ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ক্ষমতা হল মূলতঃ চুক্তিভিত্তিক ক্ষমতা। প্রাকৃতিরাজ্যের মানুষেরা নিরাপত্তার স্বার্থে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন ক'রে সার্বভৌম ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল।

(২) **নিরাপত্তাবিধায়ক ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ক্ষমতা হল মূলতঃ জনগণের নিরাপত্তা রক্ষাকারী চূড়ান্ত ক্ষমতা। তাই সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজই হল ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তা বিধান করা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(৩) **নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিহত ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ক্ষমতা হল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। এই ক্ষমতার কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারেনা। জনগণ স্বেচ্ছায় এই ক্ষমতা গঠন করেছিল এবং তাই তারা এই ক্ষমতাকে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে অবশ্যই মেনে চলবে এবং এর বিরোধিতা করবে না। তাই সার্বভৌম ক্ষমতা হল চরম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।

(৪) **চূড়ান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ক্ষমতা হল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা। এই ক্ষমতার অধীনেই নিজেদের প্রশাসিত করার জন্য চুক্তি সম্পাদন ক'রে এই ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল। এই চুক্তি ও সার্বভৌম ক্ষমতা গঠনের পিছনে জনগণের যে মানসিকতা কাজ করেছিল, হব্‌সের মতে তা' হল "I give up my right of governing myself" তাই সার্বভৌম ক্ষমতাই হল চূড়ান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা।

(৫) **অবাধ ও অসীম ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ক্ষমতার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এই ক্ষমতা হল মূলতঃ অসীম ও অবাধ ক্ষমতা। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ তাই জনজীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে যেকোন কাজ করতে পারে এবং কেউই এই ক্ষমতাকে শৃঙ্খলিত করতে পারে না।

(৬) **অবিভাজ্য ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ক্ষমতা হল অবিভাজ্য ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকে ব্যক্তিসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় না। যদি একে বিভক্ত করা হয়, তাহলে এর চরমতা ও কার্যকারিতা বিলুপ্ত হবে। এই কারণেই এই চরম সার্বভৌম ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত হবে, একাধিক ব্যক্তির মধ্যে নয়।

(৭) **মানবীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ক্ষমতা মানবীয় (human) কর্তৃপক্ষের হাতেই ন্যস্ত হবে এবং তা' সমাজের একজন বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হাতেই (বিশেষতঃ রাজার) ন্যস্ত হবে। তিনি এই ক্ষমতা ভোগ ক'রে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও জন-জীবনের নিরাপত্তা বিধান করবেন।

(৮) **আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ব্যক্তির নির্দেশই হল আইন। সমাজের শৃঙ্খলা, সুষ্ঠু প্রশাসন ও জনজীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ যে আদেশ বা নির্দেশ দেবেন, তাকে জনগণ আইনের মতো মান্য করবে এবং তাহলেই তাদের জীবন নিরাপদ হবে।

Scanned with CamScanner

মন্তব্য ঃ এইভাবেই হবস্ দেখাতে চেয়েছেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতা হল এক মানবীয় কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত ক্ষমতা, যেটি হল প্রকৃতপক্ষে অবাধ, অসীম, চূড়ান্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ, নিরঙ্কুশ ও অবিভাজ্য ক্ষমতা। হবসের মতে এই ক্ষমতাই হল আইনের উৎস। এদিক থেকে হবস্ সার্বভৌম ক্ষমতাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের চরম ক্ষমতা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

৫। হবস্ ঃ সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদ (Hobbes : Theory of Sovereignty and State Authoritarianism) ঃ

রাজনৈতিক চিন্তাধারার জগতে টমাস হবস্ এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজের উদ্ভব সংক্রান্ত যে চিন্তাধারা প্রকাশ করে গেছেন, তার মধ্যেই তাঁর চরম সার্বভৌমত্বের তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের (Authoritarianism) ধারণা নিহিত রয়েছে। সাধারণ একজন ধর্মযাজকের পুত্র হয়েও তাঁর সার্বভৌমত্বের ধারণা, সামাজিক চুক্তির ধারণা প্রভৃতি ধ্যানধারণার মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক চিন্তাধারার জগতে বিশেষ অবদান

হবসের রাষ্ট্রচিন্তার বিশেষত্ব হল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা

Scanned with CamScanner

রেখে গেছেন। অবশ্য এদিক থেকে তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের সাথে তাঁর সান্নিধ্য তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

সার্বভৌমত্ব হল রাজতন্ত্রের অবাধ ক্ষমতা : অন্যান্য সকল চিন্তাবিদ্‌গণের মত হবস্‌ও ছিলেন তাঁর পরিবেশের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। তিনি দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষকতার সূত্র ধরে রাজ পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এবং এই সম্পর্কের কারণেই তিনি রাজতন্ত্রকে গৌরবান্বিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে রাজতন্ত্রের প্রতি আন্তরিক সমর্থন রয়েছে। এবং এই কারণেই তিনি সার্বভৌমত্বকে রাজশক্তির অবাধ ও অসীম ক্ষমতা হিসাবে প্রচার করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গেটেল মনে করেন, "He believed that monarchy was the most desirable form of government, since it was least subject to passion or to dissolution by civil war." তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাজতন্ত্রই হল সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় সরকার ; যেহেতু এই সরকার আবেগের অধীন নয় এবং গৃহযুদ্ধের দ্বারা ভেঙে পড়ারও অধীন নয়।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রই হল বাঞ্ছনীয় সরকার

সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক চুক্তি : হবসের এই অবাধ সার্বভৌমত্বের বা চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে হলে তাঁর প্রচারিত সামাজিক চুক্তি মতবাদকে বিশ্লেষণ করা একান্তই দরকার ; যেহেতু এই চুক্তির মধ্য দিয়েই সার্বভৌমত্বের ধারণা গড়ে উঠেছে। হবস্‌ মনে করেন যে, সমাজ গঠনের পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। এই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক ছিল না। সেখানে সকলের সাথে সকলের এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। সেই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সব সময় অপর মানুষকে সন্দেহ করত। সেই সময়কার মানুষজনের একে অপরের প্রতি এই বিশ্বাসহীনতা ও সন্দেহপ্রবণ মানসিকতার ছবি আঁকতে গিয়ে হবস্‌ দেখেয়েছেন যে, "When taking a Journey he (man) arms himself and seeks to go well accompanied ; when going to sleep he locks his doors ; whenever in his home he locks his chests. Does he not there as much accuse mankind by his actions as I do by my words ?" অর্থাৎ হবসের বক্তব্য হল রাস্তায় বেড়াতে গেলে মানুষ যখন সশস্ত্র হয়ে যায় এবং বাড়িতে থাকার সময় সে যখন দরজায় কুলুপ এঁটে থাকে, তখন তার মানে হল এই যে, সে তার প্রতিবেশীদের বিশ্বাস করে না, বরং তাদের কাছ থেকেই সে চূড়ান্ত বিপদের আশঙ্কা করে।

চুক্তি প্রসূত সার্বভৌম সমাজের পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত

সার্বভৌমত্ব হল চুক্তির ফলশ্রুতি : এক কথায়, প্রাক্‌ সামাজিক প্রকৃতির রাজ্যে মানুষেরা একে অপরের প্রতি সন্দেহভাজন ছিল এবং তারা এক ধরনের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করত। প্রাকৃতিক রাজ্যের এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তদানীন্তন মানুষেরা শুভ বুদ্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সুস্থ জীবন যাপনের জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করে সমাজ গঠন করল এবং এই চুক্তির মাধ্যমেই তারা সমস্ত ক্ষমতা বিশেষ ব্যক্তির হাতে

সামাজিক চুক্তি প্রসূত সার্বভৌমত্ব হল ব্যক্তি-বিশেষের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

Scanned with CamScanner

সমর্পণ করল। আর সমস্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই বিশেষ ব্যক্তিই হলেন সার্বভৌম বা Sovereign. এইভাবে হবস্ দেখাতে চেয়েছেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতা হল সমাজের সকলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত অবাধ ও অসীম ক্ষমতা। এ'ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য অনেকটাই জাঁ বোদাঁর (Jean Bodin-এর) বক্তব্যেরই মতো। বোদাঁ অবাধ সার্বভৌমত্বের কথা বলতে গিয়ে বলেন, Sovereignty is the supreme politicial power (of the state) over citizens and subjects unrestrained by law." হব্সের অবাধ কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে চিন্তাবিদ্ গেটেল লিখেছেন, "He (Hobbes) insisted that Sovereignty was absolute and could not be divided, and that it must be located in a simple organ." আর সার্বভৌমই হল সমাজের মুখ্য ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক ঐক্য ও শান্তির প্রতীক। (The sovereign is the key reason and is the symbol of social unity and social peace—Sabine).

সার্বভৌমের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ চুক্তি প্রসূত সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত হব্সের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডানিং (Dunning) সুস্পষ্টভাবে বলেন, "By the sovereign is meant that individual or assembly who, by the terms of the contract on which the Commonwealth rests, is authorised to will in the stead of every party to the contract, for the end of a peaceful life." (Dunning, *History of Political Theories*, p. 281) অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদকে বোঝায়, যিনি সেই সামাজিক চুক্তির শর্তের দ্বারা শান্তিপূর্ণ জীবনের উদ্দেশ্যটির জন্য সেই চুক্তির প্রতিটি পক্ষের পরিবর্তে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে চূড়ান্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত। হবস্ দেখিয়েছেন যে, রাজনৈতিক সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি তার কর্তৃত্বকে চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌম ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করেছে। ফলে এই সার্বভৌম ব্যক্তিটি চরম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন; এবং এই ক্ষমতা দিয়ে তিনি সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য সমাজের সকলকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারেন। কারণ সামাজিক ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় সংহতি বজায় রাখা এবং বহিরাক্রমণকে প্রতিরোধ করাই হল তার কর্তব্য। আর এই ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখতে চান বলেই সার্বভৌম ব্যক্তিটি রাজনৈতিক সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। এই কারণেই হব্সের মতে সার্বভৌমত্ব হল সমাজের অবাধ, অসীম, অ-হস্তান্তরযোগ্য চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা হল দণ্ডনীয় অপরাধ এবং তাই তা' অন্যায় এবং অসংগত (unjust)। কারণ এই ক্ষমতার প্রতি উপেক্ষা হল সামাজিক চুক্তির মূল শর্তেরই পরিপন্থী।

সার্বভৌমত্ব হল ঐক্য সাধনকারী অবাধ ও অসীম ক্ষমতা

সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা করাই হল চুক্তিকে উপেক্ষা করা

সার্বভৌমত্ব ও আইনগত ক্ষমতা ঃ হব্সের সার্বভৌমত্বকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সার্বভৌম হল অবশ্যই একজন ব্যক্তি, যিনি অপর কারো সাথে ক্ষমতা ভাগ ক'রে ভোগ করেন না এবং যিনিই হলেন চরম ক্ষমতার অধিকারী রাজা। তার ইচ্ছাই হল আইন; কারণ তার নির্দেশ থেকেই আইন গড়ে ওঠে (গেটেল)। একথা ঠিক যে, রাজার ইচ্ছা

Scanned with CamScanner

প্রসূত কোন আইন খণ্ডিত হতে পারে বা বিভেদ মূলকও হতে পারে। কিন্তু তা' কোন অর্থেই রাজধর্মের নীতি বিগর্হিত হতে পারে না। কারণ রাজা বা সার্বভৌমের যে নির্দেশ থেকে আইন রচিত হয়, সেই নির্দেশ তিনি জনস্বার্থ বিচার-বিবেচনা করেই দিয়ে থাকেন। হবস্ সার্বভৌম ব্যক্তিকে চূড়ান্ত আইনগত ক্ষমতা দিয়েছেন। কারণ সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ব্যক্তিগত মতামতের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যকে দূর করার জন্য সার্বভৌমের হাতে চরম ক্ষমতা থাকা দরকার (গেটেল)। হবস্ মনে করেন যে, সার্বভৌমের বিরুদ্ধে কোন প্রাকৃতিক আইন ও স্বর্গীয় আইন প্রযুক্ত হতে পারে না; কারণ সার্বভৌমের আইনই হল প্রাকৃতিক আইন বা স্বর্গীয় আইনেরই প্রতিমূর্তি। তাই সার্বভৌমের চূড়ান্ত আইনগত ক্ষমতাই সার্বভৌমত্ব বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

সার্বভৌমের নির্দেশ হল আইন। তাই তা' অবশ্য পালনীয়

কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমত্বের বিশেষ দিক্‌চিহ্ন ঃ হব্‌সের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বে প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদকে বিশ্লেষণ করলে এর কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বা বিশিষ্ট দিক্‌চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়, যথা—

(১) সার্বভৌমত্ব হল সমাজের সকলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা অর্জিত বিশেষ ক্ষমতা।

(২) সার্বভৌম ব্যক্তিটি নিজে চুক্তির কোন স্বাক্ষরকারী পক্ষ ই নন। সুতরাং তাঁর দ্বারা চুক্তি লঙ্ঘনের ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরে নিয়ে অপর কেউ চুক্তি লঙ্ঘন করতে পারবে না।

(৩) সার্বভৌম ব্যক্তিটি যেহেতু চুক্তির মাধ্যমে সকলের সামগ্রিক ক্ষমতা লাভ করেছেন, সেহেতু সকলের স্বার্থ রক্ষা করাই তাঁর কর্তব্য।

(৪) সার্বভৌমত্ব যেহেতু চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত ক্ষমতা, সেইহেতু সংখ্যালঘু এই চুক্তিকে লঙ্ঘন করতে পরে না। হবস্ মনে করেন, "The minority not in agreement with the majority are in a state of war and all rights of war against them are available without any question of Justice (Dunning)। অর্থাৎ সংখ্যালঘু যদি সংখ্যাগুরুর সাথে একমত না হয়, তা'হলে প্রাকৃতিক রাজ্যে যুদ্ধের পরিবেশই থেকে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যাবতীয় অধিকার ন্যায়বিচারের প্রশ্ন ছাড়াই লাভ করা যায়।

এই সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ বা দিক্‌চিহ্নের প্রেক্ষাপটে Duning বলেছেন যে, Hobbes's sovereignty, therefore, implies "an absolute exemption from any just resistance or interference on the part of the subject." তাই হব্‌সের কর্তৃত্ববাদ তথা রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌমত্ব জনগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বৈধ প্রতিরোধ বা হস্তক্ষেপের হাত থেকে চূড়ান্ত অব্যাহতিকেই বোঝায়।

সার্বভৌমত্ব হল নিরঙ্কুশ; তাই তা' প্রতিরোধের ঊর্দ্ধে

সমালোচনা ও কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমত্ব ঃ

হব্‌সের এই অবাধ ও অসীম সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রসূত রাষ্ট্রীয় চরম কর্তৃত্ববাদের ধারণাটি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়ে থাকে ; যথা—

Scanned with CamScanner

(১) হব্‌স ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা তাঁর সার্বভৌমত্ব তত্ত্বে স্বীকার করেননি, বরং ব্যক্তিকে সবরকম ভাবেই সার্বভৌম ক্ষমতার অনুগামী করে তুলতে চেয়েছেন।

(২) তিনি সার্বভৌমত্বকে চরম ক্ষমতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন বলেই তিনি সার্বভৌমের স্বেচ্ছাচারিতার পথ প্রশস্ত করেছেন।

(৩) এমনকি তাঁর প্রচারিত চরম সার্বভৌমত্বের ধারণা নৈতিকতা ও আইনের প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। কারণ সার্বভৌম ব্যক্তিকেও ন্যায়-নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইনকে স্বীকার করে নিতেই হয়।

(৪) সর্বোপরি আজকের এই পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতার যুগে হব্‌সের চরম কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমত্বের ধারণা একেবারেই অচল। কারণ আজকের বিশ্বজোড়া আন্তনির্ভরশীলতার পরিবেশে কোন রাষ্ট্রই আর অবাধ ও চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী নয়।

(৫) হব্‌সের চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমত্বের ধারণাকে সর্বগ্রাসী বা সর্বাত্মক বা সামগ্রিকতাবাদী (Totalitarian) বলে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। কারণ তিনি সার্বভৌম রাজার হাতে চূড়ান্ত ও অবাধ কর্তৃত্ব সঁপে দিয়ে তাকে সর্বাত্মক ও স্বৈরাচারী করে তুলেছেন।

মন্তব্য ঃ কিন্তু তবু রাষ্ট্রীয় সংহতি ও ঐক্যের চেতনার দিক থেকে হব্‌সের চরম কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হয়। কারণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের অধীনেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলিষ্ঠভাবে সুরক্ষিত হতে পারে। চিন্তাবিদ্ ওয়েপার (Wayper) মনে করেন যে, হব্‌সের এই চরম সার্বভৌমত্বের ধারণাই রাজনৈতিক বাধ্যতাবোধ বা Political Obligation-এর দ্যোতকস্বরূপ এবং এই বাধ্যতাবোধের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রের প্রতি তথা সার্বভৌমত্বের প্রতি জনগণ আনুগত্য দেখিয়ে থাকে। ফলে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় সংহতি সুরক্ষিত হয়। এখানেই হব্‌সের কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমত্বের ধারণার সমাজ-রাজনৈতিক গুরুত্ব।

হব্‌সের কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমত্বের ধারণা রাজনৈতিক ঐক্য ও আনুগত্যের প্রেক্ষাপটে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ

Scanned with CamScanner

হয়ে উঠেছে।

৯। হবস্ ঃ বস্তুবাদী রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রবর্তক (Hobbes : Founder of the Science of Materialist Politics) ঃ

টমাস হবস্ রাজনীতির ক্ষেত্রে একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদ্ হিসাবে নিজের বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম রাজনীতির বাস্তবতার দিকটিকে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারে গৃহশিক্ষক হিসাবে রাজ আনুগত্য দেখাতে গিয়ে হবস্ চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের কথা প্রচার করেছেন এবং বাস্তব রাজনীতিতে রাজার সর্বময় কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। রাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বাস্তব ক্ষমতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের রাজনীতি তথা প্রশাসনকে যথাযোগ্যভাবে পরিচালনা করা যায় বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর এই ধারণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাজনৈতিক বাস্তবতাবাদ বা বাস্তব রাজনীতি সম্পর্কে হবসের চিন্তাধারার মূল সূত্রটি।

হবসের রাষ্ট্রচিন্তা বাস্তব রাজনীতি জ্ঞানে সমৃদ্ধ

হবস্ মনে করেন, রাজা হবেন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। এবং এই ক্ষমতা দিয়েই তিনি দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এবং জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ক্ষমতাধর রাজার দ্বারা যথাযোগ্যভাবে দেশ পরিচালনা করার কথা বলতে গিয়ে হবস্ রাজনীতিতে বাস্তববাদী চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, মূলতঃ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি, যাকে তিনি Leviathan হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তার পক্ষেই যথাযথভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করা ও জনগণকে নিজের অধীনে রাখা সম্ভব। এদিক থেকে তিনি বাস্তববাদী বা বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রবর্তক।

শক্তিশালী রাজার পক্ষে সঠিকভাবে দেশ শাসন সম্ভব—হবসের এই ধারণা বাস্তব রাজনীতি জ্ঞানকে তুলে ধরে

সাধারণতঃ হবসকে চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের সমর্থক ও সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটাই হবসের একমাত্র পরিচয় নয়। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি স্বৈরতন্ত্র বা চূড়ান্ত রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছিলেন স্বৈরতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ছাড়াও হবসের রাষ্ট্রচিন্তার আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে

Scanned with CamScanner

আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তাবিদ্‌গণের মধ্যে হব্‌স ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি রাজনীতিকে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শুধু রাষ্ট্রতত্ত্বই নয়, তাঁর সমস্ত দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি হল বৈজ্ঞানিক নীতি। এই বৈজ্ঞানিক নীতিকে বস্তুবাদ বলে অভিহিত করা হয়। তিনি বাস্তবসম্মতভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ভ্রষ্টাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে কঠোর হাতে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার। এই জন্যেই রাষ্ট্রের প্রশাসকের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকতে হবে। তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে রাজনৈতিক বাস্তব জ্ঞান থাকায় তাঁর এই বক্তব্যকে অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসম্মত বলা যেতে পারে।

হব্‌সের রাষ্ট্রচিন্তা বাস্তব-সম্মত বা বিজ্ঞানসম্মত এই জন্যই যে তিনি মনে করতেন শক্তিশালী শাসকের পক্ষেই সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব

সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সুস্পষ্টভাবে প্রাণী জগৎ থেকে আধুনিক জগতকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বিজ্ঞানের নতুন ধারণার গভীর প্রভাবে আধুনিক দর্শনের জন্ম হয়। আধুনিক দর্শনের জনক ডেকার্ত এই বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলেরই ফলশ্রুতি। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে হবস্ ছিলেন ডেকার্তের অনুসারী। কোপার্নিকাস থেকে গ্যালিলিও পর্যন্ত বিজ্ঞানিগণ বিশ্বজগতের স্থিতি ও গতি সম্পর্কে যে সমস্ত গাণিতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাঁদের বিস্ময়কর প্রভাব পড়েছিল হব্‌সের চিন্তাধারায়। সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক ধারণা, বিশেষ করে গ্যালিলিওর গতিতত্ত্ব তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই ধারণার মূল কথা হল বিশ্বপ্রকৃতিতে অস্তিত্ব রয়েছে একমাত্র বস্তুর। গাণিতিক নিয়মে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অসংখ্য কণার পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্য দিয়ে যে গতি সূচিত হয়, সেই গতিই বস্তুর যথার্থ ধর্ম। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে এই গতিসূত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে হবস্ বস্তুবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন। এই জড়বাদ বা বস্তুবাদই হল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল ভিত্তি। গতিবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্যালিলিওর বস্তুবিষয়ক গাণিতিক সিদ্ধান্ত মানব প্রকৃতির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য বলে হবস্ মনে করেন। তাঁর মতে, মানুষ ও মানুষের সমাজেও এই গতি অব্যাহত। মনুষ্য প্রকৃতির এই গতি হল তার আবেগ। যুক্তি এবং আবেগের সমন্বয়ে মানুষের প্রকৃতি গড়ে ওঠে। এই দুটি হল তার স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা। সুতরাং হবস্ মনে করেন যে, একমাত্র বিজ্ঞানের আলোকেই এই প্রাকৃতিক অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হব্‌সের চিন্তা-ধারাকে বিজ্ঞানসম্মত ক'রে তুলেছিল

বিজ্ঞানের গতিতত্ত্ব মানুষ ও সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে হবস্ মনে করতেন

হবস্ অবশ্য রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে মেকিয়াভেলির মতো রাজনীতি ও নীতিবোধকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষপাতি ছিলেন না। মানুষ একজন আত্মকেন্দ্রিক জীব এবং সে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। একমাত্র এই কথাটুকু বলার দিক থেকেই হব্‌সের সাথে মেকিয়াভেলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মেকিয়াভেলি যা' করেন নি, হবস্ কিন্তু তা'ই করেছেন। তা'হল এই যে, তিনি বলেছেন মানুষের নৈতিক জীবন বাস্তবায়িত হতে পারে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় জীবনের মাধ্যমেই। বার বার হবস্ এই যুক্তির

হবস্ রাজনীতি ও নীতিবোধের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন

Scanned with CamScanner

আশ্রয় নিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষ নিজের ভাল-মন্দ বিচার করার ব্যাপারে স্বাধীন, সেহেতু মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকলের বিচারবোধের মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা যেহেতু চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা, সেহেতু কেবল রাষ্ট্রই পারে এই সমস্ত মূল্যবোধ বা অভিমতকে বাতিল করে দিয়ে একটা সামগ্রিক বা সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে। তাই রাষ্ট্রের হাতে চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকা দরকার। কিন্তু সার্বভৌম শক্তি যদি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী না হয়, তাহলে এই কাজ বাস্তবে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না। এই কারণেই তিনি চূড়ান্ত রাজতন্ত্রকে স্বীকার করেছিলেন।

রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনেই সুস্থ জীবন ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠতে পারে

বস্তুতপক্ষে হবস্ ছিলেন একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদ্। তিনি অধার্মিক বা সন্দেহবাদী ছিলেন না। তাঁর আলোচনায় তিনি আধিভৌতিক আত্মাকে পরিহার ক'রে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, এই পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা প্রকৃতির কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আনুসারে পরিচালিত হয়। অলৌকিকতা বা আধিভৌতিক চেতনা দিয়ে বস্তুজগৎ পরিচালিত হয় না। এই দিক থেকে তাঁর চিন্তাধারার মূল প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে জ্যামিতি একটা বড় অস্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। তিনি সব কিছুকে জ্যামিতির নিয়ম অনুযায়ী বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ প্রথমে কতগুলি বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়া এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করে চিন্তার পরবর্তী স্তরে পৌঁছানোই ছিল হবস্‌সের বিশ্লেষণের পদ্ধতি। এই কারণেই স্যাবাইন বলেছেন, "Hobbes was infact the first of the great modern philosophers who attempted to bring political theory into intimate relation with a thoroughly modern system of thought".

বস্তুজগত প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হয়, অলৌকিক বিধানে নয়

যদিও হবস্‌সের বক্তব্যগুলি তাঁর সমকালীন চিন্তাধারার প্রতিফলন, তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না, যে সেগুলি রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে এক নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করেছিল। যদিও নিউটনের বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি তখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তবুও গ্যালিলিও প্রমুখের প্রচারিত বস্তুজগতের গতিতত্ত্ব সব-কিছু জাগতিক ঘটনার কেন্দ্রীয় শক্তি, এ'কথা হবস্‌ই বাস্তব চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর মতে, প্রতিটি বস্তুকে বুঝতে হবে সেই বস্তুর অন্তর্নিহিত গতির প্রকৃতি বিচার করে। মানুষের কার্যকলাপও এই গতি নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। প্রতিটি সামাজিক ঘটনা ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনও এই একই নিয়মের অধীন। এইভাবে বর্তমান কালের আচরণবাদীগণের মতো হবসও এ'কথা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন যে, বহির্জগতের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ছাড়া মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে না। মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বহির্জগৎ থেকে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সে সবের দ্বারাই বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে তার মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। মূলতঃ চিন্তা করা, কল্পনা করা, স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি হল বস্তুজগতের সাথে সংস্রবের কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিক্রিয়ার ফল। ভাষা হল এক্ষেত্রে

হবস্ বিজ্ঞানের গতি তত্ত্বকে দিয়ে জাগতিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন

বস্তুজগৎ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাই বস্তু সম্পর্কে মানুষের মনে মূল্যবোধ গড়ে তোলে

Scanned with CamScanner

সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না ; বরং ছিল তাদের মধ্যে চিরন্তন শত্রুতা এবং ধারাবাহিক দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা। এমতাবস্থায় প্রকৃতি রাজ্যে জীবনযাত্রায় কোন নিশ্চয়তা ছিল না, ছিল না সুস্থ সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শিল্পের অস্তিত্ব। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ এবং মানুষের জীবন ছিল দুর্ভাগ্যময়, জঘন্য, বিপদাপন্ন, নিঃসঙ্গ ও সংক্ষিপ্ত। হবস্ তাই মনে করেন প্রকৃতিরাজ্য ছিল দুর্বিষহ ও অসহনীয়।

প্রকৃতি রাজ্যে অস্ত্র সংরক্ষণের বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক আইন ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য

প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইন ঃ হবস্ মনে করতেন, প্রকৃতি রাজ্যে মানুষ কিছু প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাকৃতিক আইনের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হত। তিনি প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্রাকৃতিক অধিকার বলতে বোঝায় আত্মসংরক্ষণের ব্যাপারে মানুষের কিছু করার সুযোগকে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক আইন হল এমন এক ধরনের যুক্তিবুদ্ধি ও স্বাভাবিক নিয়ম, যেটি সেই আত্মসংরক্ষণের পক্ষে মানুষের প্রতিকূল কাজকে প্রতিহত বা নিষিদ্ধ করে থাকে।

অধিকারের জন্য সংগ্রাম শুরু হলে প্রাকৃতিক আইনই তাকে নিয়ন্ত্রন করত

হবস্ মনে করেন প্রকৃতিরাজ্যে প্রাকৃতিক অধিকারের জন্য মানুষজনের মধ্যে সর্বদাই 'যুদ্ধং দেহি" অবস্থা বজায় ছিল। কিন্তু অন্যদিকে প্রাকৃতিক আইন আবার এই যুদ্ধপ্রবণ মানুষকে যুক্তিবুদ্ধির বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ক'রে তাদের জীবনে শান্তি ও সংহতির সূচনা করে থাকে। হবস্ মনে করেন যে, প্রাকৃতিক আইন হল অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। কারণ, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যে শান্তির প্রয়োজন, তা'র সুস্থ অস্তিত্বের জন্যই প্রাকৃতিক আইন অপরিহার্য।

কমনওয়েলথের উৎপত্তি ঃ হবস্ মনে করতেন যে, মানুষের সুস্থ জীবনের স্বার্থে নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের অধীনে এক সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠন করা একান্ত জরুরী। তিনি মনে করেন, এই ঐক্যবদ্ধ সমাজ বা Commonwealth দুটি উপায়ে গড়ে উঠতে পারে, যথা ঃ (i) প্রতিষ্ঠানের (Institution) মাধ্যমে এবং (ii) (বাহ্যিক ঐক্যচেতনার (Acquisition) মাধ্যমে। তাঁর মতে, দুর্বিষহ প্রকৃতিরাজ্যে আত্ম-সংরক্ষণের জন্য এবং আত্মধ্বংসকারী ধারাবাহিক যুদ্ধের পরিবেশকে দূর করার জন্য মানুষের ঐকান্তিক বাসনার মধ্যেই ঐক্যবদ্ধ সমাজ হিসাবে কমনওয়েলথ্ বা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের উৎপত্তির উৎস নিহিত রয়েছে।

দুর্বিষহ প্রকৃতি রাজ্যের হাত থেকে মুক্তির জন্য কমনওয়েলথ্ গঠন

কারণে) অধিগ্রহণের

সামাজিক চুক্তি ও কমনওয়েলথের কর্তৃত্ব ঃ বস্তুতপক্ষে হবস্ দেখাতে চেয়েছেন যে, দুর্বিষহ প্রকৃতিরাজ্যের বীভৎস ও বিপদাপন্ন জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয় এবং শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ জীবনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। এই বোধ তথা অনুভূতি থেকেই প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন ক'রে ঐক্যবদ্ধ সমাজ বা কমনওয়েলথ গঠন করে। তারা চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের সকল ক্ষমতা কমনওয়েলথের হাতে সঁপে দিয়ে

সামাজিক চুক্তি প্রসূত কমনওয়েলথের কর্তৃত্বের অধীনে মানুষের সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা লাভ

Scanned with CamScanner

কমনওয়েলথের কর্তৃপক্ষকে (Authority) গড়ে তোলে ; বিনিময়ে কর্তৃপক্ষও তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও সুস্থতা বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের সুস্থ অস্তিত্বের জন্য দায়িত্বশীল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলে। অর্থাৎ তারা তাদের প্রাকৃতিক অধিকার ত্যাগ করল বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা চুক্তি প্রসূত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুস্থ জীবনের ও নিশ্চয়তা পেল।

সার্বভৌমত্ব হল চূড়ান্ত ক্ষমতা

সার্বভৌমত্ব : হবস্ মনে করেন, সার্বভৌমত্ব হল সামাজিক চুক্তিপ্রসূত শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ বা কমনওয়েলথের পরিচালনা কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। তাই কমনওয়েলথের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ সামাজিক চুক্তির বিধান অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনকারী সকল ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ জীবন পরিচালনা করার চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করে থাকে।

হবস্ মনে করেন প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সমাজের কর্তৃত্ব বা কর্তৃপক্ষ হিসেবে যে সার্বভৌম ক্ষমতাকে গড়ে তুলল, সেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ কিন্তু সেই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনও পক্ষ (Party) নন ; অথচ তার কাছেই সকলে তাদের প্রাকৃতিক অধিকার সমর্পণ করল। তাই তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা ও তাদের সুস্থ অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দেওয়াই হল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদেরও কর্তব্য হল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে সার্বিকভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করা। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে কোন প্রজা যদি আনুগত্য না দেখায় বা অমান্য করে, তা'হলে তার দ্বারা সামাজিক চুক্তিকেই অমান্য করা হবে। সেক্ষেত্রে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ অপরাধীকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সমাজে শৃঙ্খলা বিধান করবে। এ'দিক থেকে হবস্ সার্বভৌমত্বকে বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত ও অবাধ ক্ষমতা বলেই মনে করেন।

সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দায়িত্বই হল জনজীবনে সুস্থতা বিধান করা

জনগণ তাদের চুক্তিপ্রসূত সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে আনুগত্য দেখাতে বাধ্য

রাষ্ট্র ও গীর্জা : রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত হব্‌সের চিন্তাধারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাষ্ট্র ও গীর্জার (State and Church) সম্পর্ক বিষয়ক তাঁর মানসিকতা। তাঁর মতে, সার্বভৌমত্ব যেহেতু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনিয়ন্ত্রিত, অপ্রতিহত ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, সেহেতু রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি সংস্থা হিসাবে গীর্জাও সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অধীনেই থাকবে। প্রকৃতপক্ষে গীর্জা হল খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী মানুষজনের সংগঠন, যেটি সার্বভৌমের প্রতি অনুগত এবং যেটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় সমাজ বা কমনওয়েলথের সাথে একাত্মীভূত। তাই একটি ধর্মীয় সংস্থা হিসেবে গীর্জা রাষ্ট্রেরই অধীন, কোনমতেই তার উর্দ্ধে নয়।

রাষ্ট্র সার্বভৌম সংগঠন ; গীর্জা তারই অধীন সংস্থা মাত্র

রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছাড়া গীর্জা অচল

গীর্জার যাবতীয় কাজ, ধর্মগ্রন্থের সূত্রাবলী ও নির্দেশাবলী এবং গীর্জার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনকে কার্যকর হতে হলে তাদের অবশ্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। সার্বভৌমের অনুমোদন ছাড়া

Scanned with CamScanner

গীর্জা কোনও ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবেনা। সার্বভৌমই হল পার্থিব বিষয়ের মত ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়েরও চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।

গড় জনগণ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন নয়; তাই তাদের গণতান্ত্রিক শাসন কাম্য নয়

গণতন্ত্র ঃ বলাই বাহুল্য, গণতন্ত্র সম্পর্কে হব্‌সের কোন মোহ ছিল না। কারণ সাধারণ জনগণই হল গণতন্ত্রের ভিত্তি ; আর গড় জনগণের বোধ-বুদ্ধির গভীরতা সম্পর্কে হব্‌সের কোনও আস্থা ছিল না। বরং তিনি সাধারণ জনগণের বিচারবুদ্ধিকে অত্যন্ত নিম্নমানের বলেই মনে করতেন। এই কারণেই তিনি সাধারণ জনগণের দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারেন নি। বরং তিনি গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রকেই অধিকতর কাম্য বলে মনে করেছেন। কারণ তিনি মনে করতেন, সামাজিক চুক্তি প্রসূত রাজনৈতিক সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি-নিরাপত্তা বজায় রাখার ব্যাপারে শক্তিশালী রাজার পক্ষেই সুদৃঢ়ভাবে কাজ করা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। তাই রাজতন্ত্রই একমাত্র আদর্শ শাসনব্যবস্থা।

সুযোগ্য ও শক্তিশালী রাজার শাসনই কাম্য

তবে হবস্ গণতন্ত্রের সমর্থক না হলেও তিনি কিন্তু রাজকীয় স্বেচ্ছাচারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং জনজীবনকে বিপন্ন ক'রে তুলতে মোটেই চাননি। কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে, সামাজিক চুক্তির মধ্য দিয়েই প্রকৃতি রাজ্যের জনগণ তাদের সকল প্রাকৃতিক অধিকার ও ক্ষমতা সার্বভৌমের হাতে সঁপে দিল, বিনিময়ে তারা সার্বভৌমের কাছ থেকে জীবনের সুস্থতা ও সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেল। সুতরাং হবস্ সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের মধ্যে সার্বভৌমত্বের জনগণতান্ত্রিক মহিমাকেই প্রচার করেছেন।

সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে জনগণ সার্বভৌমত্ব গড়ে তুলে নিজেদের জনগণ-তান্ত্রিক মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করেন

মোটামুটিভাবে এইগুলিই হল হব্‌সের রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেগুলি রাষ্ট্রচিন্তার জগতে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনকে মহিমান্বিত ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

সমালোচনা ঃ 'বলাই বাহুল্য রাষ্ট্রচিন্তার জগতে হব্‌সের রাষ্ট্রদর্শন অসামান্য তাৎপর্য ও মহিমার অধিকারী। কিন্তু তবু তাঁর রাষ্ট্রদর্শন নানাদিক থেকে সমালোচিত হয়ে থাকে, যথা—

(১) আজকের দিনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরম সমুন্নতির যুগে হব্‌সের রাজতন্ত্র-প্রবণ ও চরম সার্বভৌমত্বসম্পন্ন কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রদর্শন খুব একটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, হবস্ জনগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে রাজতন্ত্রকেই একমাত্র আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে গণ্য করেছেন, যা' আজকের দিনের গণতান্ত্রিক প্রবণতার ঘোরতর বিরোধী।

(২) হবস্ তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে 'প্রকৃতি রাজ্য' (State of Nature) সম্পর্কে অত্যন্ত অন্ধকারময় চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি প্রকৃতিরাজ্যকে মানবজীবনের পক্ষে বিপদসঙ্কুল ও ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছেন। এর ফলে তদানীন্তন মানুষকে তিনি হিংস্র, পাশবিক ও নিষ্ঠুর বলে একতরফাভাবেই চিহ্নিত করেছেন, যা' বাস্তবে সত্য নয়।

(৩) হব্‌সের সামাজিক চুক্তির ধারণাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রকৃতিরাজ্যের প্রাক্ সামাজিক পরিবেশের আইন কানুন ও রীতি-নীতির চেতনাহীন মানুষজনের পক্ষে সুচিন্তিতভাবে

ও নিয়মকানুন সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদন করার বিষয়টি শুধু কাল্পনিকই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অযৌক্তিকও বটে।

(৪) হবস্ তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে মানুষের প্রকৃতির শুধু কুটিল ও কুশ্রী দিকটিকেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের পাশাপাশি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, উদারতা, ভালোবাসা, সংঘবদ্ধতা এবং স্বজন প্রীতির মানসিকতাও বিদ্যমান সমানভাবেই। অথচ মানব প্রকৃতির এইসব কোমল দিকগুলিকে হবস্ তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে আদৌ উল্লেখ করেন নি।

(৫) হবসের রাষ্ট্রদর্শন অনেকটাই যেন অবাস্তব ও কাল্পনিক। কারণ হবস্ মনে করেন, প্রকৃতিরাজ্যে মানুষ ছিল হিংস্র ও স্বার্থপর। অথচ এই মানুষই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর রাতারাতি দায়িত্বশীল ও সুভদ্র হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের এই আকস্মিক মৌলিক পরিবর্তনের বিষয়টি যেন নেহাতই কাল্পনিক ও অবৈজ্ঞানিক।

(৬) হবস্ তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে দেখিয়েছেন যে, স্বার্থচিন্তা বা আত্ম-স্বার্থের (Self interest) চেতনাই মানুষের আচরণের পরিচালিকা শক্তি। কিন্তু তাই যদি হয় অর্থাৎ মানুষ যদি সর্বদাই শুধু ক্ষমতা লাভের সংগ্রামেই লিপ্ত থাকে, তাহলে ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলবে কী করে, অথবা সমাজের ঐক্যবদ্ধতা বজায় রাখবে কীভাবে ? তাই ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে হবস্ বর্ণিত মানুষের স্বার্থপরতা তথা আত্মস্বার্থের ধারণা আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়।

(৭) হবসের রাষ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো সমালোচনা হল এই যে, তাঁর রাষ্ট্রদর্শন সর্বাত্মকতাবাদকে (Totalitarianism) বা রাষ্ট্রীয় চরমতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে। তিনি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের নামে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারের চরম স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ সর্বগ্রাসী তথা সর্বাত্মক ক্ষমতা ভোগ-দখল করে জনজীবনকে বিপন্ন করে তোলে।

হবসের রাষ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মারাত্মক সমালোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে।

মন্তব্য : কিন্তু তবু হবসের রাষ্ট্রদর্শনের গুরুত্বকে আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনা। বস্তুতঃ রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে হবসের রাষ্ট্রদর্শন এক অমূল্য সম্পদ, যা' পরবর্তীকালের রাষ্ট্রচিন্তাকে মহিমান্বিতভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র ও গীর্জার সম্পর্ক, রাজা ও পার্লামেন্টের সম্পর্ক, পৌর সমাজ, সামাজিক চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ধারণা পরবর্তীকালের রাষ্ট্রচিন্তাকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে হবসই তাঁর সমৃদ্ধ রাষ্ট্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার পথ প্রস্তুত করে গেছেন এবং তাই তাঁর চিন্তাধারাই আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে গেছে। এই কারণেই লিও স্ট্রস তাঁকে 'The originator of modern political philosophy বলে চিহ্নিত করেছেন। (Leo Strauss, **The Philosophy of Hobbes : Its Basis and its Genesis**, Translated from German to English by Elsa M. Sinclair.—p. xv.). প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন আধুনিক বাস্তবমুখী রাষ্ট্রচিন্তার অগ্রদূত তথা পথপ্রদর্শক স্বরূপ।

হবস : আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার পথপ্রদর্শক

Semester - IV

Paper - C-8 (Modern Western Political thought)

Unit - 2: John Locke →

(a) Natural rights → প্রাকৃতিক অধিকার

(b) Property → সম্পত্তি তত্ত্ব

Neelgagan

Scanned with CamScanner

তিনি আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সূর্যকরোজ্জ্বল প্রত্যুষের ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছেন।

৯। সম্পত্তি তত্ত্ব ও লক্ (Theory of Property and Locke) ঃ

লকের রাষ্ট্রতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সম্পত্তি বিষয়ক তাঁর তত্ত্ব। কারণ সম্পত্তি তত্ত্বের মধ্য দিয়েই লকের সমাজ-আর্থ চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন, পৌর সমাজে মানুষের সম্পত্তি হল একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। সম্পত্তির ব্যক্তিগত ভোগ-দখলের মধ্য দিয়েই পৌর সমাজের জনগণ সহজ ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে ও ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারে। বলাই বাহুল্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের যে ব্যাপক সমর্থন ও প্রচার লক্ করেছেন, তা'র মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ তথা বুর্জোয়া শ্রেণী বা বুর্জোয়া ব্যবস্থাই বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

লক্ : সম্পত্তির অধিকার হল একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক অধিকার

লক্ তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি এই তিন বিষয়ের অধিকারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি তাঁর **'Second Treatise on Civil Government'** গ্রন্থে এই তিন বিষয়ের অধিকারের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারকেই সর্বোৎকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তিনি সুস্পষ্টভাবে মনে করেন যে, সম্পত্তির অধিকারই জীবন ও স্বাধীনতার

ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার একান্ত অপরিহার্য

Scanned with CamScanner

অধিকারকে অর্থবহ করে তোলে। তিনি তাঁর **'Second Treatise on Civil Government'** গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের ৭৭নং অনুচ্ছেদে এবং নবম অধ্যায়ের ১২৩ নং অনুচ্ছেদে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারকে সম্পত্তির অধিকারেরই অন্তর্গত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, স্বাধীনভাবে সম্পত্তি ভোগ-দখলের মাধ্যমেই ব্যক্তি সঠিকভাবে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারকে ভোগ করতে পারে। তাই ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয় বলে লক্ মনে করতেন।

লক্ মনে করতেন যে, ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ। কারণ তিনি মনে করেন, ব্যক্তিসমূহ চুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে পৌর সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। তাই তিনি **'Second Treatise on Civil Government'** গ্রন্থের নবম ও একাদশ অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যে ব্যক্তিসমূহের প্রয়াসে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, তাদের সম্পত্তিকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং রাষ্ট্র কোনমতেই ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া ব্যক্তির সম্পত্তিকে দখল করতে পারে না। এবং ব্যক্তিসমূহের সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্র তাদের সম্পত্তির উপর করও ধার্য করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে লক্ রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের সরকারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষাকারী সংস্থায় পরিণত করেছেন এবং রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির সম্পত্তির সুরক্ষায় ব্যর্থ হয়, তা'হলে ব্যক্তিসমূহ সেই রাষ্ট্রের শাসকদের অপসারিত করতে পারবে বলে লক্ মনে করেছেন।

রাষ্ট্রের সরকার হল ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা

সম্পত্তির উদ্ভব ঃ লক্ মনে করেন, সম্পত্তির অধিকার হল ব্যক্তির একটি স্বাভাবিক অধিকার। তিনি মনে করেন, প্রকৃতি ব্যক্তিকে উদারভাবে তার সম্পদ দান করেছে এবং সেই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়েই ব্যক্তি তার সম্পত্তি গড়ে তুলেছে। লক্ তাঁর **'Second Treatise on Civil Government'** গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে **'of property'** নামাঙ্কিত পর্যায়ের আলোচনায় বলেছেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতির সকলের জন্য সমানভাবে এই জগতের সম্পদ ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং ব্যক্তি সেই সম্পদকে ধীরে ধীরে সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। এই প্রসঙ্গে সম্পত্তির উদ্ভব সম্পর্কে তিনি বলেন, ".....I shall endeavour to show how men might come to have a property in several parts of that which God gave to mankind in common."

লক্ মনে করেন যে, ঈশ্বর বা প্রকৃতি ব্যক্তিকে অকৃপণভাবে যে সম্পদ দিয়েছেন, সেই সম্পদের উপর মানুষ তার শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সম্পত্তি গড়ে তোলে। তাঁর মতে, প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া প্রয়োজনীয় সম্পদের উপর ব্যক্তি তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতির রাজ্যে সম্পত্তি গড়ে তুলল। সুতরাং প্রকৃতির রাজ্যে সম্পত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তির শ্রম হল একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। লকের মতে ব্যক্তি তার নিজের শ্রমশক্তির উপর নিজেই অধিকার ভোগ করবে এবং সেই শ্রমের দ্বারা অর্জিত সম্পত্তি সে নিজেই ভোগ করবে। তিনি বলেন, ".....every man has a property in his own person ; this nobody has any right to himself." বলাই বাহুল্য লক্ সম্পত্তির

প্রকৃতির সম্পদ ও ব্যক্তির শ্রমশক্তির মিলিত ফসল হল সম্পত্তি

Scanned with CamScanner

উদ্ভবের ক্ষেত্রে 'শ্রমতত্ত্বের' (Labour Theory) বক্তব্য পেশ করেছেন যা পরবর্তী কালে কার্ল মার্কসের রচনায় বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

লকের প্রচারিত শ্রমতত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ দৈহিক শ্রমের ভিত্তিতে প্রকৃতি প্রদত্ত বিষয় বা প্রাকৃতিক সম্পদ বা সামগ্রী থেকে সম্পত্তি গড়ে তোলে। এ'ক্ষেত্রে শ্রম বলতে তিনি ব্যক্তির গোটা দেহের শ্রমকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি যেমন শরীরের বিভিন্ন অংশের উপর অধিকার ভোগ করে, তেমনি ব্যক্তির শরীর শ্রম ক'রে যা' অর্জন করে, তা'র উপর অর্থাৎ শ্রমার্জিত সম্পত্তির উপর স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির অধিকার থাকবে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'The Labour of his body and the work of his hands.....are properley his. Whatsoever then he removes out of the state that nature has provided and left it in, he has mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.' অর্থাৎ লকের মতে, ব্যক্তির হাত, পা সহ গোটা দেহের শ্রমের দ্বারা অর্জিত বিষয়ই হল তার সম্পত্তি—একান্তই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

প্রাকৃতিক দ্রব্যের উপর দৈহিক শ্রমের ফলে অর্জিত বিষয়ই হল সম্পত্তি

লক্ অবশ্য সম্পত্তির উদ্ভবের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকের দৈহিক শ্রমের পাশাপাশি তার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ যথা দাস বা ভৃত্যসমূহ ও তার অধীনে পালিত জীব, যেমন—ঘোড়া, গরু ইত্যাদির শ্রমকেও মালিক-ব্যক্তির শ্রম বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ দাসদের শ্রম ও পালিত প্রাণীদের শ্রমের দ্বারা অর্জিত বিষয়ের উপরও মালিকের অধিকার থাকে এবং সেই শ্রমের দ্বারা অর্জিত বিষয়ও মালিকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ লকের মতে, (১) ব্যক্তি-মালিক, (২) তার পোষা প্রাণী ও (৩) তার অধীন ভৃত্যকূল—এই তিন বিষয়ের শ্রমের দ্বারা অর্জিত বিষয়ই হল ব্যক্তি-মালিকের সম্পত্তি। লক্ তাই সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'Thus the grass my horse bit, the turfs my servent has cut, and the ore I have digged in any place where I had right to them in common with others become my property without assignation or consent of anybody.'

মালিক, তার প্রাণী ও অধীন দাসদের শ্রমের মিলিত ফসল হল ব্যক্তি মালিকের সম্পত্তি

সুতরাং লক্ প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির উপর ব্যক্তির দৈহিক শ্রম প্রয়োগ ক'রে প্রাপ্ত বিষয়কে সম্পত্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে তাঁর এই সম্পত্তি তত্ত্বের মধ্যে দাস-ব্যবস্থার সমর্থন রয়ে গেছে। এবং এর ফলে মানুষে মানুষে বৈষম্যের স্বীকৃতিও তাঁর সম্পত্তি তত্ত্বে সমানভাবেই রয়ে গেছে।

সম্পত্তির সীমা : লক্ মনে করেন, ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট জমিকে দখল ক'রে সেখানে নিজের শ্রম আরোপ ক'রে যা' উৎপাদন করবে, তা'ই হল তার সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তির উপর থাকবে তার পূর্ণ অধিকার। তবে লক্ মনে করেন যে, ব্যক্তি মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন ক'রে সম্পত্তির অপচয় করতে পারবে না। তাঁর মতে, ব্যক্তি ততটুকুই উৎপাদন করবে এবং সেই মতো ততটুকুই সম্পত্তি গড়ে তুলবে, যতটুকু সে নিজে ভোগ-দখল

Scanned with CamScanner

করতে পারে বা পারবে। ভোগের অতিরিক্ত সামগ্রী উৎপাদন ক'রে তা'কে নষ্ট করতে মানুষ পারে না। কারণ লক্ মনে করেন, ঈশ্বর ব্যক্তিকে কোন কিছুই অহেতুক নষ্ট করার জন্য দেন নি। তাই ব্যক্তি সেই পরিমাণ সম্পত্তি গড়ে তুলবে, যেই পরিমাণ সম্পত্তিকে সে ভোগ করতে পারবে। সুতরাং ব্যক্তি সম্পত্তিকে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখতে পারবে না এবং তার অপচয়ও ঘটাতে পারবে না। এদিক থেকে লক্ ব্যক্তির সীমাহীন সম্পত্তি অর্জনের প্রয়াসের বিরোধিতা করেছেন।

কিন্তু লক্ অবশ্য পরিবর্তিত সমাজ-আর্থ পরিবেশে অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন ও অতিরিক্ত সম্পত্তি অর্জনকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে সে'ক্ষেত্রে তিনি এই অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত সম্পত্তির অপচয়ের ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন। লক্ মনে করেন, ব্যক্তিসমূহ তাদের অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত পণ্য সামগ্রীকে নষ্ট না ক'রে নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে নেবে এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রা বা অর্থের ব্যবহার তারা করবে। তিনি মনে করেন কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বেশী উৎপাদন করলে সেই ব্যক্তি অর্থ বা মুদ্রার বিনিময়ে সেই দ্রব্য অন্য ব্যক্তিকে দেবে এবং সেই মুদ্রা বা অর্থের মাধ্যমে সে সম্পত্তি অর্জন করবে। তিনি বলেন, 'If he would give his nuts for a piece of metal.....or exchange his sheep for shells or wool for sparkling pebble or a diamond.....he might heap as much of these durable things as he pleased.'

অতিরিক্ত পণ্য বা সম্পত্তিকে ব্যক্তিসমূহ নিজেদের মধ্যে অর্থের মাধ্যমে বিনিময় করে নেবে

সুতরাং লকের মতে, অতিরিক্ত পণ্য উৎপদান ও অতিরিক্ত সম্পত্তি অর্জন কোন অপরাধ নয়। বরং ব্যক্তি অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমেই স্বাভাবিকভাবেই উত্তরোত্তর সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগদখলের অধিকারী। এই অর্থ বা মুদ্রাই সম্পত্তি সংগ্রহের উৎস স্বরূপ। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, '.....Thus came in the use of money.' তাঁর মতে, অর্থ বা Money বা মুদ্রাই পুঁজি সংগ্রহের প্রধান উৎস ; এবং এই পুঁজিই ব্যক্তিকে সম্পত্তির মালিকে পরিণত করে। এ'দিক থেকে লক্ স্পষ্টভাবেই উদীয়মান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন, সন্দেহ নেই।

লকের সম্পত্তি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ঃ সম্পত্তি সংক্রান্ত লকের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে তাঁর বক্তব্যের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করে থাকি, যথা—

(i) সম্পত্তি হল প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহৃত রূপ।

(ii) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তির শ্রম আরোপিত হয়ে প্রাপ্ত বিষয়ই হল সম্পত্তি।

(iii) সম্পত্তির শ্রমতত্ত্ব অনুযায়ী (ক) ব্যক্তি মালিকের শ্রম, (খ) তার দাসদের শ্রম, ও (গ) তার পালিত জীবদের শ্রম—এই তিন প্রকার শ্রমের মিশ্রণে সম্পত্তি গড়ে ওঠে।

(iv) সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা শুধু স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিকই নয়, একান্ত বৈধও বটে।

(v) ব্যক্তি তার প্রয়োজন মত সম্পত্তি ভোগ-দখল করবে।

(vi) ব্যক্তি তার প্রয়োজনে অপরিমেয় সম্পত্তি অর্জন করতে এবং ভোগ-দখল করতে পারবে।

Scanned with CamScanner

(vii) সম্পত্তি গড়ে তোলার মাধ্যম হল অর্থ বা Money. অর্থ-সম্পদের মধ্য দিয়েই সম্পত্তি উত্তরোত্তর গঠিত ও বর্দ্ধিত হবে।

(viii) অর্থ বা Money হল বিনিয়োগযোগ্য, যা' বিনিয়োগ ক'রে উত্তরোত্তর অর্থ-সম্পদ লাভ করা যায়। তাই অর্থ বা Money হল সচল ও ক্রমবর্ধমান।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লক্ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি সম্পত্তির অধিকারকেও বৈধতা দান করেছেন।

সমালোচনা ঃ লক্ তাঁর সম্পত্তি তত্ত্বে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার পবিত্রতা রক্ষা করেছেন। কিন্তু তবু তাঁর তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বরং নানাদিক থেকে তা' সমালোচিত হয়ে থাকে, যথা—

(i) তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতাকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে সম্পত্তি আহরণের জন্য ব্যক্তির উদগ্র ও উন্মত্ত মানসিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা' আর্থিক অনাচারকেই শুধু প্রশ্রয় দেয়।

(ii) সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিসমূহের মধ্যে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ইন্ধনও তাঁর তত্ত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তিনি ব্যক্তির অপরিমেয় সম্পত্তি অর্জনের প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে সমাজ-আর্থ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের পথ প্রশস্ত করেছেন।

(iii) তিনি তাঁর সম্পত্তি তত্ত্বে স্বাভাবিকভাবেই সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনের মধ্যে অকাম্য ভেদ বিচার করেছেন।

(iv) তিনি তাঁর সম্পত্তি তত্ত্বে মানুষে মানুষে প্রাকৃতিক সাম্যের ধারণাকে স্পষ্টতই অস্বীকার করেছেন এবং ব্যক্তিসমূহের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতাগত বৈষম্যকেই প্রকারান্তরে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

(v) লক্ ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের প্রয়াসে তার দাসদের শ্রমকেও সম্পত্তির জৈবিক অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে তিনি অমানবিক দাস ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

(vi) লক্ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে তার দাসদের শ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্যকেও ব্যক্তি-মালিকের সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, অথচ দাসদের শ্রমের দ্বারা অর্জিত দ্রব্যকে দাসদের সম্পত্তি হিসাবে আদৌ স্বীকৃতি দেন নি, যা' অত্যন্ত অমানবিক ও যার-পর-নাই বৈষম্যমূলক।

(vii) লক্ ব্যক্তি-মালিকের সম্পত্তি হিসাবে তার দ্বারা লালিত-পালিত জীবকূলের (গবাদি পশুর) শ্রমে অর্জিত দ্রব্যকেও চিহ্নত করেছেন। এর ফলে ব্যক্তি তার সম্পত্তিকে যথাসম্ভব বর্দ্ধিত করার জন্য অবলা জীবদের উপর তার অত্যাচার ও শোষণ বাড়িয়ে যেতে পারবে, যাতে তার অধীন জীবেরা অতিরিক্ত শ্রম করতে পারে। এ' ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুর ও অমানবিক।

(viii) লক্ সম্পত্তি অর্জন ও পুঁজি সংগ্রহের কোন যথার্থ সীমা নির্ধারণ ক'রে দেননি। এর ফলে সমাজে পুঁজির সংগঠন ও সম্পত্তি অর্জনকে কেন্দ্র ক'রে অন্তর্বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

(ix) লক্ ব্যক্তি কর্তৃক উত্তরোত্তর হারে সম্পত্তি অর্জনের প্রয়াসকে সমর্থন করেছেন বলে তিনি ধনীর সীমাহীন ধনার্জনের মরীয়া প্রচেষ্টা ও আগ্রহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই কারণেই ধনীর দ্বারা দরিদ্রের শোষণ-পীড়নকে স্বাভাবিক প্রথা হিসাবে সমর্থন জানিয়েছেন। লকের এই প্রয়াস মানবতাবিরোধী ও বিভেদমূলক সন্দেহ নেই।

(x) লক্ তাঁর সম্পত্তি তত্ত্বের মাধ্যমে সীমাহীন সম্পত্তি অর্জনের প্রয়াসকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে পুঁজিবাদী শোষণমূলক প্রবণতাকে ও বুর্জোয়া স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

এই সমস্ত বলিষ্ঠ যুক্তি বা দিক থেকে লকের সম্পত্তি তত্ত্ব সুকঠোরভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত ঃ কিন্তু তবু লকের সম্পত্তি তত্ত্বের গুরুত্বকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। লক্ ছিলেন মূলতঃ একজন উদারনীতিবাদী। তাঁর লক্ষ্যই ছিল ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ব্যক্তির জীবন যাপনের উদারনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে বক্তব্য পেশ করা। তিনি মনে করতেন, একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ-দখলের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারে এবং ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারে। এ দিক থেকে উদারনীতিবাদী লক্ ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতার স্বার্থে সম্পত্তির অধিকারকে একান্তই জরুরী বলে মনে করতেন। তাই ব্যক্তির সুস্থ ও স্বাধীন জীবন যাপনের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপট থেকেই লকের সম্পত্তি তত্ত্বের তাত্ত্বিক গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হয়।

ব্যক্তির সুস্থ জীবনের স্বার্থেই উদারনীতিবাদী লকের সম্পত্তি তত্ত্ব তাৎপর্যপূর্ণ

Scanned with CamScanner

Sem - IV

Paper - C-8

(Modern Western Political Thought)

Unit - 3: J.J. Rousseau: Concept of General Will → সাধারণ ইচ্ছা

রুশোর সামাজিক চুক্তি / সাধারণ ইচ্ছা।

জাঁ জাক রুশো ঃ ১৭১২-১৭৭৮/Jean Jacques Rousseau : 1712-1778

প্রস্তাবনা ঃ রাজনৈতিক চিন্তাধারার জগতে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেন জাঁ জাক্ রুশো (Jean Jacques Rousseau : 1712-1778)। বিশ্বের চিন্তাশীল ইতিহাসে তিনি হলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি—মানুষের চিন্তাজগতের সকল ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর চিন্তাভাবনার মৌলিকত্বের উজ্জ্বল বিকাশ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রকেই তিনি তাঁর সারস্বত চেতনার আলোকে কমবেশী উদ্ভাসিত করেছেন এবং তার মাধ্যমে জীবন ও জগতের আধুনিকতা তথা বর্তমান কালের জনগণতান্ত্রিক প্রবণতার বার্তা চিন্তাশীল বিশ্বের দরবারে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। এইভাবেই তিনি গোটা বিশ্বের হৃদয়কে আধুনিক জীবন-চিন্তায় মথিত করেছেন এবং তার মনকে আধুনিক গণতান্ত্রিক মনস্কতায় আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছেন। এই কারণেই আধুনিক বিশ্ব তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান ও চিরকৃতজ্ঞ। চিন্তাবিদ্ ওয়েপার (Wayper) তাই রুশোর সারস্বত প্রতিভাকে উন্মোচিত করতে গিয়ে পরম উচ্ছ্বাস ও নিঁখুত আন্তরিকতায় সুন্দরভাবে বলেছেন, "Rousseau left the stamp of his strong and original genius on politics, education, religion, literature, and it is hardly an exaggeration to say.....that he is to be found at the entrance to all the paths leading to the present." (C. L. Wayper, ***Political Thought,*** p. 136).

রুশো ঃ বিশ্বের চিন্তাশীলতার জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

Scanned with CamScanner

রুশোর রাষ্ট্রদর্শনের এটি একটি মৌলিক বিশেষত্ব, সন্দেহ নেই।

২। রুশো ও সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব (Rousseau and the Theory of Social Contract) ঃ

ভূমিকা ঃ সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের অন্যতম সার্থক রূপকার হলেন রুশো। তাঁর চিন্তাদর্শনে সামাজিক চুক্তির ধারণা এক গ্রহণযোগ্য রূপ লাভ করেছে। মূলতঃ সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব রুশোর রাষ্ট্রদর্শনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌চিহ্ন। রুশো মনে করেন প্রকৃতি রাজ্যের "মহান বন্যজীব" (Noble savage) মানুষেরা সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করে পৌর বা রাজনৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এবং এই রাষ্ট্রে তারা সার্বভৌম 'সাধারণ ইচ্ছার' অধীনে সুস্থ ও স্বাধীন জীবনযাপনের নিশ্চয়তা লাভ করে। রুশোর সামাজিক চুক্তির ধারণাকে ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক গেটেল বলেন,—"The Process by which political society was ereated was social contract, since only by agreement an consent could authority be justified and liberty retained." (Gettell, ***History of Political Thought,*** p. 254)।

রুশোর সামাজিক চুক্তির ধারণাকে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রকৃতি-রাজ্য সংক্রান্ত তাঁর ধারণাকে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ রুশোর মতে, প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা সুস্থ পৌর জীবনের লক্ষ্যেই সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল।

প্রকৃতির রাজ্য ঃ চুক্তিবাদী চিন্তাবিদ্ টমাস হব্‌স ও জন লকের মত রুশোও মনে করতেন যে, প্রাক্ রাষ্ট্রীয় যুগে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করত। তবে প্রকৃতি রাজ্য সংক্রান্ত রুশোর ধারণা ঐ রাজ্য সংক্রান্ত হব্‌স ও লকের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল।

Scanned with CamScanner

হবস্ মনে করতেন, প্রকৃতির রাজ্যে চিরন্তন অরাজকতা বিরাজ করত এবং সেখানে মানুষের জীবন তাই ছিল দুর্বিষহ। অন্যদিকে লক্ প্রকৃতির রাজ্যকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সংহত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তবে তিনি (লক্) প্রকৃতিরাজ্যের আইনগত, প্রশাসনগত ও বিচারগত ক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। রুশো কিন্তু প্রকৃতিরাজ্য সংক্রান্ত হব্‌স ও লকের চিন্তাধারাকে আদৌ মেনে নিতে পারেননি। কারণ তিনি প্রকৃতিরাজ্যের স্বর্গীয় সুষমাময় ছবি এঁকেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতিরাজ্যে ছিল 'ভূ-স্বর্গ' (earthly heaven) স্বরূপ। তাই প্রাক্ রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিরাজ্যে মানুষ সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করত। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল মধুর ও আন্তরিক। সেখানে প্রাকৃতিক আইন মানুষজনের মধ্যে যথার্থ সাম্য বজায় রেখেছিল এবং তখন মানুষেরা বেশ কিছু প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত। ফলে প্রাক্ রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিরাজ্য স্বর্গস্বরূপ ছিল।

কিন্তু এই ভূ-স্বর্গ স্বরূপ প্রকৃতি রাজ্যেও শান্তি আর চিরকাল বজায় থাকল না। সভ্যতার বিকাশের পথ ধরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে উঠলে সেই সম্পত্তি মানুষজনের মধ্যেকার এতকালের প্রাকৃতিক 'সাম্যকে' (equality) ভেঙে টুক্‌রো টুকরো করে দিল এবং মানুষের 'স্বার্থ-বুদ্ধিকে' (Reason in man) জাগ্রত করে তুলল। 'মহান বন্য' মানুষেরা প্রকৃতি-রাজ্যে যে স্বর্গীয় আনন্দ ও পরম প্রশান্তি লাভ করত, তাকে সভ্যতা-প্রসূত ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবার ধ্বংস করে দিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যেন স্বর্গীয় প্রকৃতি রাজ্যের নন্দন কাননে বিষধর সর্পের মত আবির্ভূত হল এবং এই সম্পত্তিই মানুষজনের মধ্যে হিংসা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মনোভাব গড়ে তুলল এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ স্বর্গীয় প্রকৃতির রাজ্যকে অসাম্য ও শোষণ-বঞ্চনায় ভারাক্রান্ত বন্য রাজ্যে পরিণত করল। এই ক্ষতিকর ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে যুক্ত হল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা। বস্তুতপক্ষে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবার প্রকৃতি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ তথা খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। এবং এই কারণেই মানুষের মনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির চেতনা অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠতে লাগল। একদিকে দ্রুত বর্দ্ধিত জনসংখ্যার সমস্যা এবং অন্যদিকে বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতিকর প্রভাবের সমস্যা—এই দুই মারাত্মক সমস্যার চাপে পড়ে মানুষের প্রাক্ রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি রাজ্যের সহজ, সরল, স্নিগ্ধ, সুন্দর, 'মহান বন্য' প্রাকৃতিক জীবন চরম অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

স্বর্গীয় প্রকৃতি রাজ্যের নন্দন কাননে সম্পত্তির বিষধর সর্পের প্রবেশে সহজ-সরল প্রাকৃতিক জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠল

সামাজিক চুক্তি : এক সময়ের স্বর্গ সদৃশ প্রাকৃতিক রাজ্যে দ্রুত বর্দ্ধিত জনসংখ্যা ও বিভেদকামী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপজ্জনক প্রভাবের চাপে চরম অশান্তি ঘনিয়ে উঠলে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সঙ্কটাপন্ন মানুষেরা ক্রমশ উন্মুখ হয়ে উঠল। তাই তারা এবার ঐক্যবদ্ধভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করে রাজনৈতিক সমাজ (Political Society) বা পৌরসমাজ (Civil Society) বা রাষ্ট্রব্যবস্থা (Body Politic) গড়ে তুলল। রুশোর মতে, এই চুক্তিই হল সামাজিক চুক্তি। রুশো দেখিয়েছেন যে, মানুষেরা সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করে 'সাধারণ ইচ্ছা' (General Will).

Scanned with CamScanner

যা হল তাদের সকলের প্রকৃত ইচ্ছা বা শুভ কল্যাণকর ইচ্ছার সমষ্টি, তাকেই সার্বভৌম শক্তি হিসাবে চুক্তিপ্রসূত পৌর সমাজে প্রতিষ্ঠা করল। এবং সার্বভৌম 'সাধারণ ইচ্ছার জৈবিক একক বা অংশীদার হিসাবে তারাও বিনিময়ে স্বাধীনতা ও অধিকার লাভ করল। এর ফলে চুক্তিপ্রসূত পৌর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল সংহতি, শৃঙ্খলা ও পরম প্রশান্তি এবং ব্যক্তির জীবন হল নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। রুশো তাই বলেন—Social contract is supposed to established "a form of association which will defend and protect with the whole common force the person and goods of each associate, and in which each while uniting himself with all, may still obey himself alone and remain as free as before" (Rousseau, ***Social Contract Book-1,*** Chapter-VI).

এইভাবে রুশো সঙ্কটময় প্রকৃতি রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সুস্থ পৌর সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সামাজিক চুক্তিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

সামাজিক চুক্তি ও 'সাধারণ ইচ্ছা' ঃ রুশোর মতে, ব্যক্তির ইচ্ছা দুই প্রকারের, যথা—

(১) প্রকৃত ইচ্ছা বা Real Will এবং (২) বাস্তব ইচ্ছা বা Actual Will. 'প্রকৃত ইচ্ছা' হল যেখানে সর্বকল্যাণকর, মহান, শুভ ও আন্তরিক সার্বিক ইচ্ছা, সেখানে 'বাস্তব ইচ্ছা' হল ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক ও একান্ত ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছা (Particular will)। রুশো মানুষজনের অন্তর্নিহিত, পরম কল্যাণময়, পরার্থপর, বিশুদ্ধ, মৌলিক শুভ ইচ্ছা তথা 'প্রকৃত ইচ্ছার' সমষ্টিকে 'সাধারণ ইচ্ছা বা General Will বলে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গেটেল স্বচ্ছভাবে লিখেছেন, "According to Rousseau, the will of each individual was merged into a general will. The general will corresponded to the common interest of all members of the community, as contrasted with particular interests". (Gettell, ***History of Political Thought,*** p. 254).

রুশো মনে করেন, 'সামাজিক চুক্তি' প্রসূত সার্বভৌম শক্তিই হল 'সাধারণ ইচ্ছা'। প্রাক্ রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি রাজ্যের মানুষজন সুস্থ জীবনের আশায় এক চুক্তি সম্পাদন করে তাদের সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার ও ক্ষমতা স্বেচ্ছায় সমর্পণ করল এই সার্বভৌম 'সাধারণ ইচ্ছার' হাতে। আর 'সাধারণ ইচ্ছা হল যেহেতু তাদের সকলের শুভ ইচ্ছা বা প্রকৃত ইচ্ছার সমষ্টি, সেহেতু তারা প্রত্যেকেই 'সাধারণ ইচ্ছার' জৈবিক একক এবং আঙ্গিক অংশীদার। এবং এই কারণেই তারা হল প্রত্যেকেই 'সাধারণ ইচ্ছার' সার্বভৌম ক্ষমতার সমান অধিকারী। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে 'সাধারণ ইচ্ছার' মাধ্যমে সকলের কাছে সমর্পণ করেও কিন্তু কিছুই হারাল না এবং কারো অধীনেও থাকল না, বরং থাকল নিজের সার্বভৌম শক্তির অধীনেই। রুশোর মতে, 'Each man, in giving himself to all, gives himself to nobody". (Rousseau, ***Social Contract,*** Book-I).

সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার অংশীদার হিসাবে প্রত্যেকেই হল সার্বভৌম ক্ষমতার সমান অধিকারী

সামাজিক চুক্তি সাধারণ ইচ্ছা ও সার্বভৌমত্ব ঃ রুশো মনে করেন, 'সামাজিক চুক্তি' প্রসূত রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রীয় সমাজের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হল 'সাধারণ ইচ্ছা'। 'সাধারণ ইচ্ছা' হল যেহেতু এই সমাজের সকল ব্যক্তির শুভ ইচ্ছার সমষ্টি এবং এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিই হল যেহেতু সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার সমান অংশীদার, সেহেতু 'সাধারণ ইচ্ছার' সার্বভৌমত্ব চূড়ান্ত পরিণামে প্রত্যেক ব্যক্তি বা সকল মানুষের হাতেই প্রত্যর্পিত হয়। অর্থাৎ রুশোর মতে, সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার জৈবিক একক হিসাবে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ঃ

এদিক থেকে রুশো গণ-সার্বভৌমত্বেরই প্রচারক ছিলেন। রুশোর মতে, সামাজিক চুক্তিপ্রসূত সার্বভৌমত্বের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা—

(১) সামাজিক চুক্তিপ্রসূত পৌর সমাজ বা রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হল "সাধারণ ইচ্ছা"।

(২) সমাজের সকল ব্যক্তির অভিন্ন স্বার্থই সাধারণ ইচ্ছার উৎস ; তাই এর লক্ষ্য হল সমষ্টির স্বার্থ চরিতার্থ করা।

(৩) সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, এমনকি আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও জনগণের হাতেই ন্যস্ত।

(৪) 'সাধারণ ইচ্ছা' সকলের ইচ্ছা (will of all) নাও হতে পারে, তবে সকলের স্বার্থ তথা সমষ্টির স্বার্থ পূরণ করাই এর লক্ষ্য। প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেও সাধারণ ইচ্ছা সমষ্টির মঙ্গলবিধান করবে।

(৫) সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছা হল অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ, যেহেতু এই ইচ্ছা জনস্বার্থেই নিয়োজিত।

এইভাবে রুশো সামাজিক চুক্তিপ্রসূত সার্বভৌম ক্ষমতাকে সাধারণ ইচ্ছার অংশীদার জনগণের চূড়ান্ত, কল্যাণকর ও মহৎ ক্ষমতা বলে চিহ্নিত করেছেন।

সমালোচনা ঃ রুশোর সামাজিক চুক্তির ধারণা নানা দিক থেকে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে, যথা—

(১) রুশোর সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব ইতিহাসগতভাবে অবাস্তব ; কারণ চুক্তি সম্পাদন করে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে—এই ঘটনার কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য নেই। তাই তাঁর তত্ত্ব নিছক কাল্পনিক।

(২) রুশোর চুক্তিতত্ত্ব দার্শনিক ও যুক্তিশাস্ত্রগত দিক থেকে বিভ্রান্তিকর ; কারণ প্রকৃতি রাজ্যের 'মহান বন্য' মানুষজনের মানসিকতার স্তর এত উন্নত ছিলনা যে, তারা চুক্তি স্বাক্ষর করার যুক্তি-বুদ্ধি ও আইনগত বিবেচনা করতে পারে। বস্তুতপক্ষে তাদের যুক্তি-বুদ্ধির স্তর ও মানসিক প্রবণতার মাত্রা যদি উন্নতই হত, তাহলে প্রকৃতি রাজ্যেই তারা যাবতীয় সমস্যাকে পরিহার করে তাকে সুন্দর ও সু-উপভোগ্য রাজ্যে পরিণত করতে পারত ; এবং এর জন্য পৌর সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ত না।

Scanned with CamScanner

(৩) রুশোর চুক্তি তত্ত্ব আইনগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও বেমানান, কারণ চুক্তি সম্পাদন করার উন্নত আইনগত মানসিকতা একমাত্র সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রের আইন-কানুনের সুশৃঙ্খল পরিবেশ থেকেই মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সংকটাপন্ন প্রকৃতি রাজ্যের বিশৃঙ্খল ও আইনগত ধ্যান-ধারণাবিহীন পরিবেশ থেকে কখনোই তা মানুষের মনে গড়ে উঠতে পারে না। অথচ রুশো সেই 'বন্য' ও আইনগত চিন্তা-চেতনাবিহীন প্রকৃতি রাজ্যেই সহজ-সরল আইন সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের চুক্তি সম্পাদন করার কথা বলেছেন। তাই তাঁর তত্ত্ব আইনগত দিক থেকে একান্তই অসংগত।

(৪) রুশোর সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সাধারণ ইচ্ছা' বা 'General Will'. তাঁর মতে, চুক্তি প্রসূত সমাজে সাধারণ ইচ্ছাই হল সার্বভৌম শক্তি। সাধারণ ইচ্ছা সকল ব্যক্তির শুভ ইচ্ছার সমষ্টি হলেও কোন ব্যক্তি যদি সাধারণ ইচ্ছার অনুগামী না হয়, তাহলে সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির উপর বলপ্রয়োগ করে তাকে সমষ্টির স্বার্থের অনুগামী করে তোলা হবে এবং তাকে জোরপূর্বক স্বাধীন করা হবে। রুশোর মতে, He will be "forced to be free" স্বাভাবিকভাবেই রুশোর চুক্তিতত্ত্বের সাধারণ ইচ্ছার ধারণায় বলপ্রয়োগের অবকাশ থেকেই গেছে। অর্থাৎ রুশোর বর্ণিত সার্বভৌম 'সাধারণ ইচ্ছা' হবস্ বর্ণিত সার্বভৌম শাসকের মতো অবাধ, অসীম ও সর্বগ্রাসী ক্ষমতার অধিকারী। চিন্তাবিদ্ হার্ণশ (Hearnshaw) তাই বলেন, "General will of Rousseau is Hobbes' Leviathan with its head chopped off."

(৫) রুশোর চুক্তি তত্ত্ব ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থীও বটে। কারণ চুক্তিপ্রসূত সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে ব্যক্তি মূলতঃ নিঃস্ব ও পরাধীনই হয়ে পড়ে। বস্তুতপক্ষে সামাজিক চুক্তির মধ্য দিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে ব্যক্তিসমূহ তাদের দ্বারা সৃষ্ট সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার কাছে তাদের এতকালের যাবতীয় প্রাকৃতিক অধিকার সমর্পণ করে। কিন্তু তা করতে গিয়েই তারা সকলেই সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার সমান সৃষ্টিকর্তা হয়েও রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বন্ধন ও শৃঙ্খলের মধ্যেই থেকে যায়। এদিক থেকে রুশোর বর্ণিত মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন হয়েও চুক্তি প্রসূত রাষ্ট্রের শৃঙ্খলের মধ্যেই থেকে যায়। অর্থাৎ রুশোর বর্ণিত মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন হয়েও চুক্তি প্রসূত রাষ্ট্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যদিও সে নিজে কিন্তু রাষ্ট্র ও সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার জৈবিক একক ও সমান অংশীদার। রুশোর চিন্তার এ এক অদ্ভুত স্ববিরোধিতা, সন্দেহ নেই।

(৬) রুশোর সামাজিক চুক্তি তত্ত্বে বর্ণিত 'সাধারণ ইচ্ছার' ধারণাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। বস্তুতপক্ষে 'সাধারণ ইচ্ছাকে' রুশো সকল ব্যক্তির বিশুদ্ধ, মৌলিক ও শুভ ইচ্ছার সমষ্টি বলে চিহ্নিত করলেও 'সাধারণ ইচ্ছার' কোনও স্বরূপকে উপলব্ধি বা আবিষ্কার করা যায়না। মূলতঃ সাধারণ ইচ্ছা হল একপ্রকার নিছক কাল্পনিক ও বিমূর্ত ধারণা। তাছাড়া সকলের শুভ ইচ্ছাকে একত্রিত করে সমষ্টিবদ্ধ সাধারণ ইচ্ছার বাস্তবায়ণ বা রূপায়ণ করা আদৌ সম্ভব নয়। তাই অসম্ভব ও অবাস্তব 'সাধারণ ইচ্ছার' ধারণার উপর সামাজিক চুক্তি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রুশো তাঁর তত্ত্বকে নিছক কাল্পনিক তত্ত্বে পরিণত করেছেন।

Scanned with CamScanner

(৭) রুশো জনগণের সদর্থক ও সক্রিয় অংশগ্রহণে ভরপুর যে সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার কথা বলেছেন, তা একমাত্র প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রেই কার্যকর হতে পারে, আজকের দেশজোড়া বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা সম্পূর্ণতঃই অকার্যকর। ফলে আধুনিক কালের বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে রুশোর সাধারণ ইচ্ছাভিত্তিক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা কোনও তাৎপর্য বহন করেনা। অধ্যাপক স্যাবাইন (Sabine) তাই বলেন, "His belief that a small community like the city-state is the best example of the general will, made it impossible for him to discuss contemporary politics with much point." (George Sabine, ***A History of Political Theory,*** Indian edition, 1973, p. 539)।

(৮) সমগ্র সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব সংক্রান্ত রুশোর ধারণাই কাল্পনিক প্রকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিছক কাল্পনিক প্রকৃতি রাজ্যের প্রকল্পকে দিয়ে আলোচনা শুরু করে তারই উপর রাষ্ট্র বিষয়ক তত্ত্বকে স্থাপন করেছেন। ফলে রাজনৈতিক আনুগত্য তথা রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্যের মৌলিক প্রশ্নটিকে সমাধান করার জন্য তাঁর গৃহীত তাত্ত্বিক কাঠামোটি বাস্তবিকপক্ষে নেহাৎ কাল্পনিক প্রকল্পে পরিণত হয়েছে, যেহেতু এই তাত্ত্বিক প্রকল্পটিকে ইতিহাসগত, দার্শনিক, তর্কশাস্ত্রসম্মত ও আইনগত দিক থেকে আদৌ বাস্তবসম্মত বলে প্রমাণ করা যায়না। তাই রুশোর চুক্তি তত্ত্ব সর্বাংশেই অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক ও অবাস্তব তত্ত্ব বলে সমালোচিত হয়ে থাকে।

রুশোর সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে এই সমস্ত কঠোর ও বন্ধুর সমালোচনা উত্থাপিত হয়ে থাকে। অধ্যাপক গেটেল তাই এই তত্ত্বকে "Historically unsound and logically fallacious" অথবা ঐতিহাসিক দিক থেকে অসংগত ও যুক্তিশাস্ত্রগতভাবে ভ্রান্ত এবং "One of the paradoxes in the history of political thought" বা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসের এটি স্ববিরোধ বলে চিহ্নিত করেছেন (Gettell, ***History of Political Thought,*** p.-258)।

রুশোর চুক্তিতত্ত্ব হল ভ্রান্ত ও স্ববিরোধী তত্ত্ব

মূল্যায়ন ঃ সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত রুশোর ধারণার বিরুদ্ধে এই সমস্ত জোরালো সমালোচনা উত্থাপিত হলেও তাঁর ধারণার মৌলিক গুরুত্বকে আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনা। নানা দিক থেকে তাঁর চুক্তিবাদী ধারণার গুরুত্বকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, যথা—

(১) রুশোর সামাজিক চুক্তির ধারণা সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিহাসগতভাবে এক বৈপ্লবিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব জনগণের সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশের যে চিত্র তুলে ধরেছে, তা পৌর সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে এক রীতিমত মৌলিক পরিবর্তনমুখী বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছে। তাই রুশোর তত্ত্বই সামাজিক চুক্তি বিষয়ক ধারণাকে তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমান্বিত করে তুলেছে। মূলতঃ রুশোর তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর থেকেই সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের ধারণার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সমাজে সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

(২) রুশো তাঁর চুক্তিতত্ত্বে জনগণের চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমাজের উদ্ভবের কথা প্রচার করতে গিয়ে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তার জগতকে প্রসারিত করেছেন। তিনি তাঁর চুক্তি-

Scanned with CamScanner

তত্ত্বে 'সাধারণ ইচ্ছা' ধারণাটির মধ্য দিয়ে আপামর মানুষের মহৎ মর্যাদার চেতনাকে তুলে ধরেছেন।

(৩) রুশোর সামাজিক চুক্তির ধারণা থেকেই আমরা সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে এক জনপ্রিয় তত্ত্ব লাভ করে থাকি। রুশো 'সাধারণ ইচ্ছা' ধারণার মাধ্যমে জনগণকেই প্রকৃত সার্বভৌম বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই জনগণই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সরকার জনগণকে নয় এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিকতারই প্রতীক।

(৪) রুশোর সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতিকে সর্বপ্রথম যথার্থ মর্যাদা দান করেছে। তিনি 'সাধারণ ইচ্ছা', 'গণসার্বভৌমত্ব' 'দায়িত্বশীল সরকার' ইত্যাদি ধারণার মধ্য দিয়ে জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর চুক্তিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে 'বাক্ স্বাধীনতা', 'সাম্য' প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আদর্শকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন।

(৫) রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' ধারণার বিশেষত্ব হল এই যে, তিনি এই ধারণার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করে রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এক অভিনব চিন্তাধারার পথ সূচিত করেছেন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রের হাতে কর্তৃত্ব থাকলেও রাষ্ট্রের কর্তব্য হল জনকল্যাণ সাধন করা ও ব্যক্তির স্বার্থ সুরক্ষিত করা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গেটেল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্পর্কে রুশোর মানসিকতাকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে লিখেছেন,—"Thus while the authority established was absolute, following Hobbes, individuals still possessed equal rights, following Locke.....Rousseau believed that there could be no conflict between authority vested in the people as a whole and their liberty as individuals" (Gettell, ***History of Political Thought,*** p. 254). বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী চিন্তাধারা হিসাবে রুশোর সামাজিক চুক্তির ধারণা মহিমান্বিত তাৎপর্যের অধিকারী হয়ে উঠেছে।

এই সমস্ত দিক থেকে সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত রুশোর বক্তব্যের অনন্যসাধারণ তাৎপর্যকে স্বীকার করতেই হয়।

মন্তব্য ঃ সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রুশো তাঁর সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের মাধ্যমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় বিদ্যমান বুদ্ধিবাদী ও যুক্তিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই প্রাকৃতিক অধিকার, স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রী, গণ-সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি আধুনিক জীবনের সু-মহান আদর্শগুলিকে জোরালোভাবে প্রকাশ করেছেন। ফলে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাতেই রাষ্ট্রদর্শনের নতুন ধারার সূচনা ঘটে। চিন্তাবিদ্ কোল (Cole) তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছেন, Rousseau "respresents the passage from a traditional theory rooted in the Middle Ages to the modern philosophy of the state" (G. D. H. Cole, Introduction to ***The Social Contract and Discourses,*** p. vii). বলাই বাহুল্য, এইখানেই রুশোর চুক্তি তত্ত্বের সার্থকতা তথা অনুপম বিশিষ্টতা।

'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বই হল রুশোর রাষ্ট্রদর্শনের মূল ভিত্তি

Scanned with CamScanner

৩। রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব (Rousseau's Theory of General Will) ঃ

ভূমিকা ঃ রাষ্ট্রচিন্তার জগতে জাঁ জাঁক রুশোর অবদান তাঁর সাধারণ ইচ্ছা (General Will) তত্ত্বের কারণেই চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব হল এমন একটি ধারণা, যেটি হল রুশোর রাজনৈতিক চিন্তাধারার মৌল ভিত্তি স্বরূপ। এক কথায় এই তত্ত্বই হল রুশোর রাজনৈতিক দর্শনের মূল চাবিকাঠি। Henry Maine রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "The world has not seen more than once or twice in all the course of History a literature which has exercised such prodigious influence over the minds of men, over every cast and shade of intellect as that which emanated from Rousseau between 1749 and 1762. অর্থাৎ ১৭৪৯ থেকে ১৭৬২ সাল পর্যন্ত সময়ে রুশোর চিন্তাধারা সকল ধরনের বিচার বুদ্ধির উপর এবং সকল মানুষের মনের উপর যে অসাধারণ প্রভাব ফেলতে পেরেছিল, তেমন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সমস্ত পৃথিবী সমগ্র ইতিহাস ধরে একটি বা দুটির বেশী দেখেনি (Maine, ***Ancient Law,*** Chapter, iv)।

রুশোর এই অসাধারণ 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বটি সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করতে হলে তাঁর প্রচারিত সামাজিক চুক্তি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারাকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণ ইচ্ছা ও সামাজিক চুক্তি ঃ রুশো মনে করেন যে, রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তিনি সামাজিক চুক্তিকে এমন একটি উপাদান বলে মনে করেন, যেটি সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের নৈতিক ও সমষ্টিগত ইচ্ছার সংস্থা গঠন করে। তাঁর মতে, এই সমষ্টিগত সংস্থা বা জনসমাজ (Community) সামাজিক চুক্তি থেকেই তাঁর ঐক্য, তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তার জীবন এবং তার 'ইচ্ছা' লাভ করে থাকে। তিনি এই জনসমাজ বা সমষ্টিগত সংস্থার সমষ্টিগত ইচ্ছাকে 'সাধারণ ইচ্ছা' বা "General Will' নামেই চিহ্নিত করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় "By the free act of those who enter into the pact all their rights and powers are resigned to the community and this respective wills are merged into and superseded by the General Will." অর্থাৎ যারা চুক্তি সম্পাদন করল, তাদের স্বাধীন কাজের দ্বারা তাদের সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা সমাজের হাতে গচ্ছিত হল এবং তাদের এই নিজস্ব ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছাতে একাত্মীভূত হল এবং তার দ্বারা সংরক্ষিতও হল।" তাই রুশোর মতে, "This general will tends to be the preservation and welfare of the whole and every part and is the source of law". এই কারণেই রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছাই হল সার্বভৌম বা Sovereign ; এবং এই ইচ্ছার বাস্তব প্রয়োগ বা প্রকাশই হল সার্বভৌমত্ব বা Sovereignty.

সাধারণ ইচ্ছা ও প্রকৃত ইচ্ছা ঃ রুশোর প্রচারিত এই সাধারণ ইচ্ছা হল সমাজের ব্যক্তিসমূহের 'প্রকৃত ইচ্ছা' বা 'Real Will'-এর সমষ্টি মাত্র। আর ব্যক্তির 'প্রকৃত ইচ্ছাই' হল তার বৌদ্ধিক ইচ্ছা বা Rational Will। এবং বৌদ্ধিক ইচ্ছা হল আবার সেই ইচ্ছা, যা, ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে সমষ্টিগত স্বার্থকেই বড় করে দেখে। তাই রুশোর

Scanned with CamScanner

ধারণা অনুযায়ী' "সাধারণ ইচ্ছা" তখনই গড়ে ওঠে, যখন কোন সমাজের সকল সদস্য তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে ত্যাগ করে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের লক্ষ্য চরিতার্থ করবার জন্য মিলিত হয়।

প্রকৃত ইচ্ছা ও বাস্তব ইচ্ছা ঃ রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বে ব্যক্তির দুই প্রকার ইচ্ছার কথা বলেছেন, যথা—

i) প্রকৃত ইচ্ছা বা Real Will এবং ii) বাস্তব ইচ্ছা বা Actual Will. রুশোর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু কল্যাণকামী তথা শুভ ইচ্ছা রয়েছে, যেগুলি দিয়ে সে সমাজের মঙ্গলসাধন করতে চায়। ব্যক্তির এই শুভ ইচ্ছাই হল তার 'প্রকৃত ইচ্ছা'। সমাজের সকল ব্যক্তির এই ইচ্ছাই হল, রুশোর মতে, 'সাধারণ ইচ্ছা' বা 'General Will'। অন্যদিকে ব্যক্তির নিজের কিছু একান্ত ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব স্বার্থমূলক ইচ্ছা থাকে, যেগুলি দিয়ে সে তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। এই একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছাই হল, রুশোর মতে, ব্যক্তির 'বাস্তব ইচ্ছা' বা Actual Will। রুশো মনে করেন, সমাজের সাধারণ ইচ্ছাই ব্যক্তিসমূহের বাস্তব ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তাহলেই ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হবে।

সাধারণ ইচ্ছা বনাম সকলের ইচ্ছা ঃ রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে 'সকলের ইচ্ছা' বা 'Will of all' থেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে সকলের ইচ্ছা বা Will of all হল ব্যক্তিসমূহের আবেগপ্রবণ অ-বৌদ্ধিক ইচ্ছা, যা, আত্ম স্বার্থের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং যা সমাজের সার্বিক কল্যাণের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন। পক্ষান্তরে তিনি 'সাধারণ ইচ্ছা'কে ব্যক্তিসমূহের প্রকৃত ইচ্ছার সাথে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছা হল বৌদ্ধিক ও নিরুদ্বেগ ইচ্ছা, যা সমাজের সার্বিক কল্যাণের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। তাই রুশো এই প্রকৃত ইচ্ছাকেই তার 'সাধারণ ইচ্ছা'র একমাত্র ভিত্তিভূমি বলে মনে করেন।

সাধারণ ইচ্ছা হল স্থায়ী ইচ্ছা ঃ রুশো মনে করেন যে, সকলের ইচ্ছা বা Will of all-এর মধ্যে যেহেতু ব্যক্তির স্বার্থপর ইচ্ছাগুলো নিহিত থাকে, সেহেতু সকলের ইচ্ছা কোনমতেই সাধারণ ইচ্ছার ভিত্তি হতে পারে না। কারণ 'সাধারণ ইচ্ছা' সকলের মঙ্গলজনক স্বার্থের প্রতীক স্বরূপ, কোন ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের নয়। রুশোর বর্ণিত 'সাধারণ ইচ্ছা' সম্পর্কে গিলক্রীষ্ট (Gilchrist) মন্তব্য করেছেন, "General Will is necessarily the unanimous will of the citizens. Absolute unanimity is necessary for the original contract. After the state is established, consent is implied in the fact of presidence." তাছাড়া রুশো মনে করেন যে, সাধারণ ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবে সকলের ইচ্ছা থেকে এই কারণেই পৃথক যে, এই ইচ্ছা হল স্থায়ী ; কারণ এই ইচ্ছা হল বৌদ্ধিক, নিরুদ্বেগ ও ব্যক্তিগত স্বার্থহীন। তাই তাঁর মতে, "The most general will is always the most just and the voice of the people is the voice of god." এই কারণেই, তাঁর মতে, সাধারণ ইচ্ছার প্রাধান্যই হল সরকারী অর্থনীতির প্রথম নীতি এবং সরকারের মৌলিক নিয়ম তথা "The first principle of the public economy, the fundamental rule of government."

Scanned with CamScanner

সাধারণ ইচ্ছা বনাম বিশেষ ইচ্ছা ঃ তবে মনে রাখতেই হবে যে, রুশোর সাধারণ ইচ্ছা হল সমষ্টিগত সংস্থা অর্থাৎ চুক্তির দ্বারা গঠিত পৌর সমাজের নিজের সদস্যদের দিক থেকে গড়ে ওঠা কল্যাণকর ইচ্ছার সমষ্টি। কিন্তু অন্য সমাজের দিক থেকে তা আর সাধারণ ইচ্ছা নয়, বরং তা হল বিশেষ ইচ্ছা বা Particular Will. রুশোর মতে, এই সমস্ত বিশেষ ইচ্ছা বা অপেক্ষাকৃত কম সাধারণ ইচ্ছা কোন সমাজের সাধারণ ইচ্ছার বিরোধী নয়। তাঁর মতে, কোন সমাজের যা কিছু ইচ্ছা সর্বকল্যাণকর, সেটাই তার সদস্যদের কাছে 'সাধারণ ইচ্ছা' ; কিন্তু অন্য সমাজের কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ 'ইচ্ছা' বা Particular Will. এদিক থেকে রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে একাত্ম করে ফেলেছেন। তাঁর ভাষায় Sovereignty is the absolute power which the social crontract gives the body politic over all his members when this power is directed by the general will, that is, by the will of the citizens as a croporate whole." এই কারণেই রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' স্থায়িত্ব ও যথার্থ্য—এই দুটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চরিত্রায়িত হয়ে থাকে। আর সাধারণ ইচ্ছা স্থায়ী ও যথার্থ ইচ্ছা বলেই এই ইচ্ছা সর্বশক্তিমান তথা সার্বভৌম। তাই বলা হয়, "The general will of Rousseau is Hobbes' Leviathan with its head chopped off" (Hearnshaw).

সাধারণ ইচ্ছার দিক্‌চিহ্ন ঃ রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্ব থেকে কতগুলি বিশেষ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে, যথা—

i) এই তত্ত্ব অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যক্তির মত কোন সাংগঠনিক প্রাণময় সত্তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ii) সাধারণ ইচ্ছা সমগ্র সমাজের কল্যাণ ও সংরক্ষণের চেষ্টা করে থাকে এবং তাই এই ইচ্ছা হল আইনের একমাত্র উৎস।

iii) সাধারণ ইচ্ছা সমাজের সকল স্বার্থে সুস্থ প্রশাসন গড়ে তোলে।

iv) সাধারণ ইচ্ছা কোন রাষ্ট্রকে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবেই মনে করে, কারণ রুশোর মতে 'The most General Will is the most just' এবং সেই কারণেই সাধারণ ইচ্ছা সার্বজনীন কল্যাণসাধনেরই ইঙ্গিত বহন করে।

সংক্ষেপে এই বিশ্লেষণটুকুই হল রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্ব। এবার তত্ত্বটিকে আমরা মূল্যায়ন করে দেখতে পারি।

সমালোচনামূলক মূল্যায়ন ঃ রুশোর সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বটিকে নিছক কাল্পনিক ধারণা বলে দোষারোপ করা যেতে পারে না। কারণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে এই সাধারণ ইচ্ছার ধারণাকে অবশ্যই বাস্তবারিত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সদস্যদের পক্ষেই একত্রিতভাবে সর্বজনীনভাবে তাদের ইচ্ছা গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। তবে বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সাধারণ ইচ্ছা গড়ে তোলা সম্ভব নাও হতে পারে। বস্তুতঃ বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সাধারণ ইচ্ছা গড়ে তোলা এক জটিল সমস্যাই বটে। কারণ রাষ্ট্র যত বড় হয়

সাধারণ ইচ্ছা ততই কম স্থায়ী ও কম কার্যকরী বা কর্মক্ষম হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের সদস্যদের পক্ষে সর্বজনীনভাবে কোন ইচ্ছা পেশ করা এক দুরূহ সমস্যাই বটে।

'সাধারণ ইচ্ছার' প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয় ঃ রুশো মনে করতেন যে, সাধারণ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করা যায় না ; কারণ যে মুহূর্তে এই ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তৎক্ষণাৎ এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই কারণেই রুশো 'সাধারণ ইচ্ছার' ধারণার মধ্যে কোন বড় রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি, কারণ বড় রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা ছাড়া প্রশাসনকে পরিচালনা করা অসম্ভব। কিন্তু ছোট রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ এলাকার ছোট আকৃতির জন্যই সেখানে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা আবশ্যক নয়। ফলে এখানে সকলের সমবেত প্রয়াসে 'সাধারণ ইচ্ছা' গড়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু মনে রাখতেই হবে আজকের দিনের বৃহৎ রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব নয়। অথচ রুশো তাঁর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বে প্রতিনিধিত্বের পক্ষপাতী নন। তাই তিনি আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

সর্বাত্মকতাবাদের প্রশ্রয় ঃ রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বের প্রধান অসুবিধা হল কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বগ্রাসী বা সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন (totaltitarian) হয়ে ওঠার সম্ভাবনাটিই। এক কথায় রুশো তাঁর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বে রাষ্ট্রের সর্বাত্মকতাবাদ বা Totalitarianism-কে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছাই হল সর্বশক্তিমান। সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বের এই সর্বাত্মকতাবাদ রুশোর সেই ধারণা থেকেই গড়ে উঠেছে, যে ধারণা অনুযায়ী তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তি তার সমস্ত ইচ্ছাকে সাধারণ ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। ফলে ব্যক্তি সাধারণ ইচ্ছারই অধীন। এর ফলে সে কোনমতেই 'সাধারণ ইচ্ছাকে' উপেক্ষা করতে পারে না এবং কেউ যদি 'সাধারণ ইচ্ছাকে' উপেক্ষা করে, তাহলে, রুশোর মতে, তাকে বলপূর্বক সেই ইচ্ছার অনুগামী করে তোলা হবে এবং তার মাধ্যমে তাকে 'জোরপূর্বক স্বাধীন' (Forced to be free) করে তোলা হবে। এইভাবে সাধারণ ইচ্ছা-তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী ক'রে তুলেছেন। এদিক থেকে উইলিয়াম ব্লামের (William Blahm) মতে, রুশো সর্বাত্মকতাবাদী মূর্তির পূজা করেছেন। অনুরূপভাবে আপ্পাদোরাই (Appadorai) মনে করেন, "Rousseau was scarcely aware of the fact that unrestricted power of general will might result in an absolutism." অর্থাৎ রুশো এই ঘটনা সম্পর্কে কদাচিৎই সচেতন ছিলেন যে, সাধারণ ইচ্ছার অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা চরমপন্থীবাদেই পরিণত হতে পারে।

মন্তব্য ঃ কিন্তু তবুও আমাদের এই কথা স্বীকার করতেই হয় যে, রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব রাজনৈতিক চিন্তার জগৎকে ব্যাপকভাবে আলোকিত করেছে। কারণ এই তত্ত্বই সমাজজীবনের সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার কথা বলে। তাছাড়া বলা হয়ে থাকে যে, রুশোর এই তত্ত্ব সংঘবদ্ধ জীবনের বা গোষ্ঠী জীবনের ক্রমপ্রগতিমূলক দিকটিকেই তুলে ধরে। এই কারণেই রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব সমাজ-রাজনৈতিক চিন্তাধারার জগতে বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত, সন্দেহ নেই।

রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্ব সমাজ-রাজনৈতিক তাৎপর্য মহিমান্বিত

Scanned with CamScanner

Sem - IV

Paper - C-8

Unit → ④ : Hegel → ① Dialectics → দ্বন্দ্ববাদ

② State → রাষ্ট্র

Material given by Dr. Amrita Banerjee

Scanned with CamScanner

ফ্রেডরিক হেগেল : ১৭৭০-১৮৩১ / Friedrich Hegel : 1770-1831

প্রস্তাবনা : ফ্রেডরিক হেগেল : ১৭৭০-১৮৩১ (Friedrich Hegel : 1770-1831) : আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেন জর্জ উইলহেম্ ফ্রেডরিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)। তিনি ইতিহাসের প্রকৃতি, জ্ঞানের স্বরূপ, ঈশ্বরের সর্বময়তা, বিশ্বপ্রকৃতি, রাষ্ট্রের মহিমান্বিত ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাঁর সমগ্র আলোচনাই সম্পাদিত হয়েছিল আদর্শবাদ ও অধিবিদ্যাগত দর্শনের (Metaphysics) প্রেক্ষাপটে। অধিবিদ্যাগত বিশ্লেষণের ফলে তাঁর রাষ্ট্রদর্শন কখনো কখনো দুর্বোধ্য হয়ে উঠলেও তাঁর রাষ্ট্রদর্শনই কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জগতকে অনুপম মহিমা ও সীমাহীন গভীরতা দান করেছে। এই কারণে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের আলোকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা আলোকিত ও আলোড়িত হয়েছে। চিন্তাবিদ্ ক্যাসিরার

হেগেল : রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

Scanned with CamScanner

৫। দ্বন্দ্ববাদ ও হেগেল (Dialectics and Hegel) ঃ

ভূমিকা ঃ জার্মান রাষ্ট্রদার্শনিক হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি হল দ্বন্দ্ববাদ। দ্বন্দ্ববাদের ভিত্তিতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের মনের প্রতিটি ভাব বা চিন্তা সর্বদাই তাঁর বিরোধী ভাব বা চিন্তার জন্ম দিয়ে চলেছে। এই ভাব ও বিরোধী ভাবের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত হয়ে উঠলে অপর এক তৃতীয় ভাব এসে এদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। এই ভাবে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতে মানুষের মনের ভাব এগিয়ে চলে বলে হেগেল মনে করেন।

হেগেল ঃ ভাবের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মনের অগ্রগতি

হেগেল মানুষের মনের ভাবের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মানুষের মনে প্রথমে যে ভাব বা চিন্তা গড়ে ওঠে, সেই ভাব বা চিন্তার বিরোধী ভাবও সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে ওঠে। এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ভাব ও বিরোধী ভাবের মধ্যেকার বিরোধ এক সময়ে চূড়ান্ত হয়ে ওঠে এবং এই বিরোধ তৃতীয় ভাব বা চরম ভাব গড়ে না ওঠা পর্যন্ত ক্রমাগত চলতে থাকে। হেগেল মনে করেন, এই চরম ভাবের মধ্যেই ভাব ও বিরোধী ভাবের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। তাঁর মতে, তৃতীয় ভাব উপস্থিত হলে ভাব ও বিরোধী ভাবের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের যেমন অবসান ঘটে, তেমনি তার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যেও উন্নীত হওয়া যায়।

ভাব, বিরোধী ভাব ও সমন্বয়ধর্মী ভাবের ফলে দ্বন্দ্বের অবসান

হেগেল মনে করেন, মানুষের মনে প্রথমে যে ভাব গড়ে ওঠে, তাকে তিনি বাদ বা Thesis বা মূল প্রতিপাদ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। এই বাদ-রূপী ভাবের বিরোধী যে ভাব অর্থাৎ যেটি হল নেতিবাচক ভাব, তাকে তিনি প্রতিবাদ বা Anti-thesis বলে চিহ্নিত করেছেন। এই বাদ ও প্রতিবাদের মধ্যেকার সংঘর্ষের সমাধান করে যে তৃতীয় ভাব, তাকে তিনি সম্বাদ বা Synthesis বলে চিহ্নিত করেছেন। হেগেল মনে করেন, সম্বাদের মধ্য

বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদের ফলে ইতিহাসের বিকাশ

Scanned with CamScanner

দিয়েই বাদ ও প্রতিবাদের মধ্যেকার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। এদিক থেকে তিনি মানুষের মনোজগতের যাবতীয় পরিবর্তনকে বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিশ্লেষণ করেছেন।

ইতিহাসের দ্বন্দ্বিক বিকাশ

হেগেল মনে করেন যে, মানুষের মনোজগতের কোন ভাবই স্থায়ীভাবে বিশুদ্ধ বা ভ্রান্ত নয়। প্রত্যেক ভাবের মধ্যেই বিশুদ্ধি ও বিভ্রান্তি থাকে। কিন্তু এই বিশুদ্ধি ও বিভ্রান্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ভাবের অগ্রগতি ঘটতে থাকে এবং 'চরম সত্য' মূর্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং 'প্রকৃত সত্যে' বা 'চরম সত্যে' উপনীত হওয়ার জন্য ভাবের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকেই একমাত্র মানদন্ড হিসাবে হেগেল গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের মনোজগতের যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তার মূলে রয়েছে এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। মানুষের মনোজগতের চিন্তা বা ভাবের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগত এই যে পরিবর্তন তথা অগ্রগতি, তার উপরই গোটা মনোজগতের পরিবর্তন নির্ভর করে বলে হেগেল মনে করেন। তাঁর মতে, মানুষের মনোজগতের পরিবর্তনই বস্তুজগতের পরিবর্তনকে সূচিত করে। তিনি মনে করেন, বস্তুজগতের বস্তুর পরিবর্তন কোন মতেই সম্ভব নয়, যদি না মানুষের মনের ভাবনাচিন্তার অগ্রগতি ঘটে। মানুষের মনের ভাবনাচিন্তাই বস্তু জগতের বস্তুর পরিবর্তনের চাবিকাঠি স্বরূপ। তাই হেগেলের মতে, মানুষের মন বা ভাব আগে এবং বস্তু মনেরই পরে। অর্থাৎ তিনি মন ও বস্তুর মধ্যে মনের অগ্রগামিতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

হেগেল ঃ মন ও বস্তুর মধ্যে মনের প্রাধান্য

প্রকৃতপক্ষে হেগেল মনোজগত ও বস্তুজগতের মধ্যে মনোজগতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, বস্তুর সৃষ্টির রহস্য হল মানুষের মন বা ভাব। মানুষ আগে কোনকিছু ভাবে বা পরিকল্পনা করে, তারপরে সেই ভাবনা বা পরিকল্পনামত কার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ বস্তুর ভাবনা মানুষের মনে এলে তবেই সেই বস্তু গঠিত হতে পারে। এদিক থেকে বলা যেতে পারে, তাজমহলের পরিকল্পনা প্রথমে মানুষের মনে উদীত হওয়ায় সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরে তাজমহল নামক বস্তুটি গঠিত হয়েছে। এইভাবে হেগেল দেখাতে চেয়েছেন যে, মন বা মনের ভাবনা (The Idea) আগে, বস্তু পরে।

সম্বাদে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়

হেগেল অবশ্য মনে করেন যে, বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে তথা বস্তু জগতের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনের ভাবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; কিন্তু এই ভাবের কোনো চিরন্তন স্থায়িত্ব ও বিশুদ্ধ অস্তিত্ব নেই। কারণ প্রত্যেকটি ভাবনাই সর্বদা তার বিরুদ্ধ ভাবনার জন্ম দিয়ে চলেছে। এই ভাবনা ও বিরুদ্ধ ভাবনা অর্থাৎ বাদ ও প্রতিবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সম্বাদ এসে উপস্থিত হয়ে তাদের উভয়কে আত্মস্থ করে ফেলে। এবং সম্বাদে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাব সংক্রান্ত প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। এইভাবে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় মনোজগতের পরিবর্তন ঘটে বলে হেগেল মনে করেন। তাই তাঁর মতে, মনোজগতের পরিবর্তনই বস্তুজগতের পরিবর্তনকে সূচিত করে।

হেগেলের এই সম্বাদ তাঁর **Philosophy of Right** নামক গ্রন্থে সুস্পষ্ট হয়ে

Scanned with CamScanner

ওঠে। এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের বক্তব্যকে তিনি বাদ (Thesis), প্রতিবাদ (Anti-thesis) ও সম্বাদ (Synthesis) রূপে সাজিয়ে দ্বন্দ্ববাদকে মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি এই গ্রন্থের প্রথম অংশে বর্ণিত স্বাধীন মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আইন ব্যবস্থা, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে বাদ বা প্রতিপাদ্য বা thesis রূপে চিহ্নিত করেছেন। এই গ্রন্থের নৈতিকতা শীর্ষক অধ্যায়টির বক্তব্যকে তিনি প্রতিবাদ বা Anti-thesis রূপে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে তিনি মানুষের অধিকার, আইনব্যবস্থা ও মূল্যবোধকে নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করতে চেয়েছেন। এবং এই গ্রন্থের পরিবার, জনসমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনাকে তিনি সম্বাদ বা Synthesis রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং এই আলোচনাতেই তিনি বিষয়গত মূল্যবোধের সঙ্গে আত্মগত স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্কের বিষয়টিকে তিনি জনসমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সূচিত করার ব্যবস্থা করেছেন। এইভাবে তিনি তাঁর **Philosophy of Right** গ্রন্থটিকে দ্বন্দ্ববাদের ব্যাখ্যা হিসাবে তুলে ধরেছেন।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ : বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদ

মন্তব্য : সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হেগেল দ্বন্দ্ববাদের ভিত্তিতে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দ্বন্দ্ববাদের মূল বিষয় হল মানুষের মন বা মনের ভাবনা। মনের ভাবনার সঙ্গে তার বিরুদ্ধ ভাবনার দ্বন্দ্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে থাকে এবং তৃতীয় সমন্বয়ধর্মী ভাবনার মধ্যে ভাবনা ও বিরুদ্ধ ভাবনার তথা বাদ ও প্রতিবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটে এবং পরম সত্য প্রকাশিত হয়। এইভাবে বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদের চক্রাকার আবর্তনের মধ্য দিয়েই হেগেল মনোজগতের ও বস্তুজগতের যাবতীয় পরিবর্তন ও অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগত ব্যাখ্যার মধ্যেই হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তার বিশেষত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভাবের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতেই হেগেলের রাষ্ট্রদর্শন মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে

৬। রাষ্ট্র ও হেগেল (State and Hegel) :

ভূমিকা : আদর্শবাদী রাষ্ট্রচিন্তানায়ক হিসেবে হেগেলের নাম চিরস্মরণীয়। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পূর্ণভাবেই আদর্শবাদ বা ভাববাদের ছায়াপটে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। তিনি কান্ট, ফিক্‌টে প্রমুখগণের ভাববাদী চিন্তাধারার পথ অনুসরণ করে রাষ্ট্রকে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তাঁর মতে রাষ্ট্র একটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের ইচ্ছাই হল অবশ্য পালনীয় আইন। এদিক থেকে হেগেল মনে করেন, "The state is an end in itself."

হেগেল : রাষ্ট্র একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান

হেগেলের মতে, রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে যেমন গড়ে ওঠেনি, তেমনি তা আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমেও গড়ে ওঠেনি। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্র হল একটি সচেতন সৃষ্টি (Conscious Creation)। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হল মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবৃত্তির বিকাশের ও বিবর্তনের সচেতন ফলশ্রুতি। তাই রাষ্ট্র একটি প্রাকৃতিক সংগঠন বা Natural Organism.

হেগেল রাষ্ট্রকে ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন জৈবিক সংগঠন বলেই মনে করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের ইচ্ছা হল বিশুদ্ধ যুক্তিবুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ। এদিক থেকে রাষ্ট্র স্বাধীনতার সংরক্ষক।

Scanned with CamScanner

তিনি মনে করেন যে, রাষ্ট্র তার Universal will বা সার্বিক ইচ্ছার দ্বারা ব্যক্তির particular will বা বিশেষ ইচ্ছার উপর আধিপত্য করে। ফলে ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছাচারিতা দূরীভূত হয় এবং সার্বিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিক থেকে, তাঁর মতে, রাষ্ট্র হল নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়েও কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা, মানসিকতা ও আবেগকে উপেক্ষা করেননি। তাঁর নিজের কথায়, "Two elements, therefore, enter into the object of our investigation, the first, the idea, the second, the complex of human passion ; the one the warp, the other the woof of the vast arrays well of Universal History"

রাষ্ট্র ঃ একটি জৈবিক সংগঠন

এইভাবেই হেগেল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সাথে ব্যক্তির স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের সার্বিক ইচ্ছাকে ব্যক্তির বিশেষ ইচ্ছার সাথে একাত্ম করে দেখার মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত রয়েছে। এদিক থেকে হেগেল একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, স্বাধীনতা কখনোই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনতা বিহীন নয়। বরং রাষ্ট্রের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই তথা রাষ্ট্রের সুযোগ্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই যথার্থ স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। এই কারণেই ব্যক্তির ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের বা সমষ্টির ইচ্ছার অনুগত থাকতে হয়।

কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়

হেগেল মনে করেন, ব্যক্তির ইচ্ছার ত্রুটি-বিচ্যুতি রাষ্ট্রের সমষ্টিগত ইচ্ছার আলোকে সংশোধিত হয়ে যায়। এই কারণেই ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষ সমাজবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ জীব ; তাই তার জন্ম থেকেই তাকে সমাজের বিভিন্ন সংঘ-সমিতির কোলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পরিবার প্রতিষ্ঠানটিই ব্যক্তির কাছে প্রথম সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরিবারের পরিচর্যার পথ ধরেই সে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে। হেগেল মনে করেন এই বৃহত্তর সমাজটি হল সার্বিক প্রতিযোগিতায় ভরা একটি সংগঠন। এই সমাজ সর্বদাই ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে এক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন রচনা করে চলেছে। তাই এই সমাজ পরিচালনার মূলে রয়েছে মুনাফা প্রবণতা বা "profit motive". এই জন্যই এ ধরণের সমাজ কখনোই মানুষের লক্ষ্য হতে পারে না। হেগেল তাই এই প্রতিযোগিতামূলক (বুর্জোয়া) সমাজের উর্দ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ এক আদর্শ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনবোধ করেছেন। এবং এই আদর্শ প্রতিষ্ঠানটি হেগেলের মতে হল "রাষ্ট্র"।

রাষ্ট্র হল আদর্শ প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্রের উৎপত্তির দিক থেকে হেগেল তাই বলেছেন যে ব্যক্তির জীবনে পরিবার হল Thesis (বাদ), প্রতিযোগিতামূলক সমাজ হল Anti-thesis (প্রতিবাদ) এবং এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে রাষ্ট্র, যা হল Synthesis (সম্বাদ্ বা সমন্বয়)। তাঁর মতে, পরিবার ও সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সম্বাদরূপী রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। হেগেলের নিজের কথায়, "The essence of the modern state is that the universal is bound up with the full freedom of

রাষ্ট্র হল সম্বাদরূপী প্রতিষ্ঠান

Scanned with CamScanner

particularity and the welfare of individuals, that the interest of the family and of bourgeois society must connect itself with the state". এই কারণে হেগেল মনে করেন যে, পরিবার ও সমাজের উপাদানগুলি রাষ্ট্রের মধ্যেই সংহত রূপ লাভ করে।

এইভাবে হেগেল রাষ্ট্রকে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। এই রাষ্ট্রকে ব্যক্তির মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রের নির্দেশই হল আইন। ব্যক্তি এই আইনকে উপেক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্র যখন আইনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে, তখন তা করা হয় শুধুমাত্র ব্যক্তির স্বার্থপরতার প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্যই। অর্থাৎ তার খামখেয়ালিপনাই রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, কিন্তু তার প্রকৃত ইচ্ছাটি নয়। তার আত্মগত বা স্বার্থপর স্বৈরাচারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র নিজের যৌক্তিক ইচ্ছাবোধ তুলে ধরে। হেগেলের মতে, রাষ্ট্রের মধ্যেই সার্বিক ইচ্ছা বা Universal will এক যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। এই কারণেই রাষ্ট্র হল একটি বৌদ্ধিক ও নৈতিক সত্তা।

রাষ্ট্র ঃ একটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

হেগেল রাষ্ট্রকে তাই living Organism বা জীবন্ত সত্তা হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। এমন কি রাষ্ট্রকে স্বর্গীয় সংগঠন হিসাবেও তিনি অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের জীবন্ত সত্তারূপী ও স্বর্গীয় সংস্থারূপী রাষ্ট্রের প্রকৃতি সংক্রান্ত হেগেলের বক্তব্যকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করে ওয়েপার লিখেছেন, "It is a natural growth. It is a whole greater than the parts which are intrinsically related to it and which have meaning only in so far as the whole gives them meaning. It is an end in itself. It develops from within, shaped by the nationalising of the spirit and helped on by that very development of its citizens which it alone makes possible". (Wayper, ***Political Thought***, p. 169.)

রাষ্ট্র ঃ একটি জীবন্ত সত্তা

হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ঃ হেগেলের রাষ্ট্র সম্পর্কিত এই ধারণা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। এগুলি হল—

(i) হেগেল রাষ্ট্রকে একটি ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ করে ও সমাজের স্বার্থপরতা দূর করে রাষ্ট্র এক স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করে বলেই হেগেল মনে করেন। এই কারণেই তাঁর মতে, "The State is the march of god on earth" বা 'রাষ্ট্র হল পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদচারণা।'

(ii) হেগেল রাষ্ট্রকে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক বিকাশের (Spiritual evolution) সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করেন। রাষ্ট্র হল নিজেই নিজের উদ্দেশ্য (End in itself)। এই কারণেই রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়।

(iii) হেগেলের মতে, রাষ্ট্র হল একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন। ব্যক্তিসমূহ রাষ্ট্রের এক একটি বিশেষ জৈবিক সত্তা বলেই তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীন। ব্যক্তির যা কিছু উৎকর্ষতা, তা রাষ্ট্রের জন্যই। হেগেল তাঁর **The Philosophy of History** গ্রন্থে একথা সুস্পষ্টভাবেই

Scanned with CamScanner

বলেছেন, "All the worth which the human being possesses, all spiritual reality, he possesses only through the state."

(iv) রাষ্ট্র একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি জীবনে নিশ্চয়তা ও সুস্থিরতা বিকাশের জন্য রাষ্ট্র কিছু নৈতিক মানদণ্ড বা নির্দেশ গড়ে তোলে এবং ব্যক্তির তাই উচিত সেই নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এই কারণেই হেগেল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে অ-বিতর্কিত ও অ-প্রতিরোধযোগ্য বলে মনে করেন। তাঁর ভাষায়ঃ So mightly a form must trample down many an innocent flower ; it must crash to pieces many an object in its path."

(v) এছাড়া হেগেল প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই স্বাধীন সার্বভৌম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জনসংগঠন বলে মনে করেন। তাই অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে কোন রাষ্ট্রের কী ধরনের সম্পর্ক থাকবে, তা সেই রাষ্ট্রেরই উপর নির্ভর করে। এদিক থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রই তার নিজস্ব স্বার্থ ও লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং প্রয়োজন হলে যুদ্ধের দ্বারাও অন্য রাষ্ট্রের সাথে তার বিবাদ মেটাতে চেষ্টা করবে। হেগেল তাই যুদ্ধকে কোন মন্দ বা খারাপ ব্যাপার (evil) বলে মনে করেন না, বরং তিনি মনে করেন—যদি কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থকে বিপন্ন করে তোলে, তাহলে বিপন্ন রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব হল বিপন্নকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হেগেল তাঁর তত্ত্বের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে এক আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ও ভূষিত করেছেন। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে অনুসরণ ও মান্য করার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় থাকার যে তত্ত্ব তিনি প্রচার করেছেন, তাতে রাষ্ট্রীয় সংহতির পথই প্রশস্ত হয়। তদুপরি রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও হেগেলের রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে ওয়েপার (Weyper) যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "He made politics something more than a mere compromise of interests, and that he made law something more than mere command. It is not an ignoble doctrine that the police state is inadequate and that the state must be viewed as part of man's moral end." (Wayper, **Political Thought,** pp. 170-1)

হেগেলের রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধারণার এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

সমালোচনা ঃ রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলের আদর্শবাদী বিশ্লেষণ রাষ্ট্রকে মহিমান্বিত করে তুললেও তাঁর প্রচারিত রাষ্ট্রের ধারণা কোনমতেই সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়। রাষ্ট্রসংক্রান্ত তাঁর তত্ত্বকে বিভ্রান্তিকর, বিপজ্জনক ও ভ্রান্ত তত্ত্ব বলেই সমালোচনা করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্র সংক্রান্ত হেগেলের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনাগুলি হল এইরকম—

(১) হেগেল রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের কাছে ব্যক্তির সার্বিক আত্মসমর্পণের কথা বলেছেন এবং তা বলতে গিয়েই তিনি ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে বলিদান করেছেন। জোড (Joad) মনে করেন, "The absolutist doctrine is, in fact, inimical to individual liberty". কারণ "The state exists for the individual, the individual does not exist for

Scanned with CamScanner

the state." প্রকৃতপক্ষে হেগেল ব্যক্তির স্বাধীনতা সংরক্ষণের কোন প্রকৃত ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

(২) হেগেল রাষ্ট্রের উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন এবং রাষ্ট্রকে নৈতিক সমালোচনার ঊর্ধ্বে রেখেছেন। কিন্তু তিনি একথা বোধহয় বিস্মৃত হয়েছেন যে, ব্যক্তির স্বার্থেই রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তির গঠন নয়। ফলে রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা ব্যক্তি করতে পারবে না —এ ধরনের অন্ধ ধারণা কোনমতেই সমাজ জীবনের পক্ষে শ্রেয় নয়।

(৩) হেগেল নৈতিকতার দাবিতে যুদ্ধ ঘোষণাকে সর্বান্তঃকরণ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই স্বীকৃতি মানব জাতির বিপদের সংকেত বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর এই স্বীকৃতির ফলেই ইতালির ফ্যাসিবাদ, জার্মানের নাৎসিবাদ প্রভৃতি যুদ্ধবাজ চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে।

(৪) হেগেল রাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত সার্বভৌম সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যুগে হেগেলের এই চূড়ান্ত ও একক প্রাধান্যভোগী এবং চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের ধারণা অচল হয়ে পড়েছে।

(৫) হেগেল রাষ্ট্রকে স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক সংস্থার পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের এই ঐশ্বরিক ও আদর্শ রূপের ধারণাই হিটলার, মুসলিনী, নেপোলিয়ন প্রমুখগণকে স্বৈরাচারী ক্ষমতা ভোগ-দখলে উদ্দীপিত করেছিল। এবং এর ফলশ্রুতিতেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নেই সারা ইউরোপ-এর রাজনৈতিক আকাশ বিপজ্জনক সংকেতে ভরপুর হয়ে উঠেছিল।

(৬) রাষ্ট্রসংক্রান্ত হেগেলের ধারণা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে বিপজ্জনক। রাষ্ট্রই ব্যক্তিত্ব বিকাশ, সভ্যতার প্রকাশ, মহিমান্বিত আদর্শের স্ফূরণ ইত্যাদির পক্ষে চূড়ান্ত আদর্শ স্থানীয় ও একান্ত অনুসরণীয়—একথা বলতে গিয়ে হেগেল সভ্যতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে বিপথে চালিত করেছেন এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছেন বলে জোড (C.E.M. Joad) মনে করেন। অনুরূপভাবে ওয়েপার (Wayper) বলেন, "The claim that each sovereign state is sufficient for its members is the greatest danger for modern civilization."

(৭) সর্বোপরি হেগেল রাষ্ট্রের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব আরোপ করে ব্যক্তির জীবনে এক চরম অভিশাপ বয়ে এনেছিলেন। এর ফলে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের কাছে সার্বিকভাবে আত্মত্যাগ করার কথা তিনি বলেছিলেন। এভাবেই তিনি রাষ্ট্রের সর্বাত্মকতাবাদ বা Totalitarianism-কেই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

এই সমস্ত দিক থেকে রাষ্ট্র সংক্রান্ত হেগেলের ধারণা সুতীব্রভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে।

মন্তব্য : কিন্তু তবু হেগেলের রাষ্ট্র তত্ত্বের গুরুত্বকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক যে, হেগেল রাষ্ট্রকে চরম ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের

Scanned with CamScanner

অধীন করে তুলেছিলেন। কিন্তু তার পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও সামাজিক সংহতি। সমাজের সকল ব্যক্তিই যদি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে ব্যক্তিগত স্বৈরাচার অবদমিত হয় ও সামাজিক শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে। এই কারণেই তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে প্রচার করে রাষ্ট্রীয় সংহতির পথই প্রশস্ত করেছেন। অন্ততঃ এই দিক থেকে হেগেলের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বের গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হয়।

রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রেক্ষাপটে হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্ব তাৎপর্যপূর্ণ

Scanned with CamScanner

Semester - IV

Paper - C-8 (Notes material given by Dr. Amrita Banerjee)

Unit → 5: Karl Marx and Fredrick Engels:

Dialectical and Historical Materialism

① দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

Q 1.) মার্কস ও এঙ্গেলস্ এর উৎপত্তি মার্কসবাদের মূলসূত্র গুলি আলোচনা করো।

Q 2.) → Direct Question হলো → দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কি তা আলোচনা করো (Q 3.) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আলোচনা করো?

Scanned with CamScanner

Ans 1) Introduction / ভূমিকা

প্রস্তাবনা ঃ রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মার্কসবাদ অনন্যসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। মূলত মার্কসবাদই মানবসমাজের বিবর্তনের ইতিহাসকে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে এক সুস্থ, সুষম ও বাস্তবসম্মত সমাজবাদী সমাজ গড়ে তোলার বক্তব্য পেশ করেছে। মার্কসবাদ অনুযায়ী, শিল্পসমৃদ্ধ পুঁজিবাদী যুগে পুঁজিপতিদের শোষণে শোষিত-বঞ্চিত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বা সমাজবাদী সমাজ বা সমাজতন্ত্র। এই সমাজবাদী সমাজকে মার্কস ও এঙ্গেলস্ যেহেতু 'বিপ্লব' নামক বাস্তব উপায়টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চান, সেহেতু তাঁদের প্রচারিত সর্বহারা বিপ্লবপ্রসূত সমাজবাদী সমাজই হল যথার্থই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ। মার্কসবাদ অনুযায়ী, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণিবিশেষের হাতে না থেকে বরং সমগ্র সমাজের হাতেই থাকে। তাই এখানে উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানাভোগী ও মালিকানাহীন শ্রেণি দুটি অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্র এই পরস্পর বিবদমান শ্রেণি দুটির অস্তিত্ব থাকে না। ফলে এই সমাজে শ্রেণিভেদ না-থাকায় শ্রেণিশাসন থাকে না, শ্রেণিশোষণ থাকে না এবং থাকে না কোনও শ্রেণিসংগ্রাম তথা শ্রেণিবিপ্লব। বরং এই সমাজের সামাজিকীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থায় সকলেই অংশগ্রহণ করে নিজেদের ন্যায্য অংশ তথা লভ্যাংশ লাভ করে এবং তার মাধ্যমে সুস্থ, সুষম, সুখী ও মুক্ত জীবনযাপন করে। তাই মার্কসবাদ প্রচারিত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদই হল বাস্তবসম্মত যথার্থ মানবিক সমাজ। তাই তা হল মহিমাময় তাৎপর্যে মহিমান্বিত।

(১) মার্কসবাদের উৎস Sources of Marxism :

সূচনা ঃ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনৈতিক চিন্তার জগতে মার্কসবাদ হল মানব সমাজের গতিপ্রকৃতির বিকাশ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। বস্তুতপক্ষে, বিজ্ঞানসম্মত চরিত্র তথা বাস্তব রাজনৈতিক ভিত্তির জন্যই এই মতবাদ মানবসমাজের গতিপ্রকৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাবের অধিকারী। মার্কসবাদই মানবসমাজ ও তার গতি-প্রকৃতির এমন এক আন্তরিক, বস্তুনিষ্ঠ, অথচ সহজ ব্যাখ্যা দান করে, যা অন্য কোনো মতবাদে পাওয়া সত্যই বিরল। সমাজজীবনের ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবসমাজের ক্রমবিকাশের এক নিটোল বস্তুসাপেক্ষ চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছে। এই কারণেই মার্কসবাদ সমাজজীবনের বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক মতবাদের মর্যাদা লাভ করেছে।

সমাজজীবনের বিশ্লেষণ মার্কস ও এঙ্গেলসের উদ্ভাসিত এই মতবাদের (মার্কসবাদের) ভিত্তি কিন্তু বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। মার্কস ও এঙ্গেলস্ সমাজজীবনের

Scanned with CamScanner

ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে সুনিপুণভাবে পর্যালোচনা করতে গিয়ে তদানীন্তন কাল পর্যন্ত বিদ্যমান যাবতীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব, ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন উৎকর্ষতামূলক চিন্তাধারার গতিশীল প্রভাব মার্কসীয় চিন্তাধারায় সহজেই অনুপ্রবেশ করেছে।

মার্কসবাদের উৎসসমূহ ঃ বস্তুতপক্ষে, মার্কস ও এঙ্গেলস্ বিভিন্ন রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির উৎকর্ষতামূলক দিক থেকে রসদ বা উপাত্ত সংগ্রহ করে নিয়ে সমৃদ্ধ মার্কসবাদ গড়ে তুলেছিলেন। একথা তাঁরা (মার্কস ও এঙ্গেলস) মুক্তকণ্ঠে অকপটে স্বীকার করেছেন। এঙ্গেলস উদারভাবে একথা স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বিদ্যমান 'কাল্পনিক সমাজবাদের' উপরই সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। সেন্ট সাইমন, চার্লস্ ফুরিয়ে ও রবার্ট ওয়েন প্রমুখ কাল্পনিক সমাজবাদীগণের সমাজবাদ বিষয়ক ধারণাকেই তাঁরা (মার্কস ও এঙ্গেলস্) বাস্তবসম্মতভাবে তথা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া মার্কস ও এঙ্গেলস্ দ্বিধাহীনভাবে 'জার্মান মতাদর্শ' ('German Ideology'), 'ব্রিটিশ অর্থনীতি' ('British Economy'), 'ফরাসি সমাজবাদ' (French Socialism) প্রভৃতির প্রভাবকে নিজেদের রচনায় আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে মার্কস্বাদ হল বিভিন্ন উৎসের সমাহারে সৃষ্ট মানবসমাজ বিষয়ক ও একসমন্বয়ধর্মী বাস্তবসম্মত, সমৃদ্ধ অনন্যসাধারণ মতবাদ।

বলাই বাহুল্য, বিভিন্ন উৎস থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস্ তাঁদের চিন্তাধারার রসদ রস বা উপাত্ত সংগ্রহ করে নিলেও তাঁদের চিন্তাধারা কিন্তু মোটেই নিছক পরগাছা চিন্তাধারা মাত্র নয় এবং এর জন্য তাঁদের সেই চিন্তাধারা এতটুকুও মৌলিকতা হারায়নি। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক উপাত্ত বা রসদ বা তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস্ সেই তথ্য বা উপাত্তগুলিকে একসূত্রে সুনিপুণভাবে গ্রথিত করে এক অভিনব সমাজ-রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন এবং নিজেদের চিন্তাধারার তাত্ত্বিক ভিত্তিটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছিলেন। এখানেই নিহিত রয়েছে মার্কসবাদের নিজস্ব মৌলিকতা।

Scanned with CamScanner

(২) মার্কসবাদের মূলসূত্র (Main Tenets of Marxism)

সূচনা ঃ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মার্কসবাদ মানবসমাজের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে এবং রাষ্ট্রচিন্তার জগতকে করেছে সম্প্রসারিত ও সম্প্রচারিত। এই মতবাদই হল রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে এক বাস্তবসম্মত তথ্য বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ এবং এই কারণে এই মতবাদ এক গতিশীল তত্ত্বও বটে।

মার্কসবাদ মূলত কতকগুলি সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যাদের সন্ধান পাওয়া যায় কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো পুস্তিকায় এবং মার্কস লিখিত দাস ক্যাপিটাল গ্রন্থে। এই সূত্রগুলি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, মূল্য তত্ত্ব, উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব, শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি।

নীচে এগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) **দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) ঃ** কার্ল মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যদিয়ে বস্তুজগতের পরিবর্তনের মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী, 'বস্তুই' হল আদি এবং 'মন' হল তার অনুবর্তী। বস্তুই হল বস্তুজগতের পরিবর্তনের মূল উৎস। এই মতবাদের মূল কথা হল—

আমাদের সামনে এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, সেই জগৎ হল বস্তুজগৎ। বস্তুজগতের বস্তুগুলি নিরত পরিবর্তনশীল। বস্তুর এই পরিবর্তন আসে বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রবণতা দুটির ('বাদ' ও 'প্রতিবাদের' মধ্যেকার) সংঘর্ষের পথ ধরে। বস্তুর এই পরিবর্তন পরিমাণগত দিক থেকে গুণগত দিকে পরিচালিত হয় অর্থাৎ, বস্তুর গুণ বা চরিত্র বা ধর্মের আমূল পরিবর্তন ঘটে। বস্তুর পরিবর্তনের ধারা পর্যায়ে পরিত্যক্ত বস্তুও আত্মসংস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন বস্তুর আকার ধারণ করে ফিরে আসতে পারে এবং সে এবার তাকে অস্বীকারকারী পূর্বেকার বস্তুটিকে পরিত্যাগ বা বর্জন করে থাকে। এই অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি বা নেতির নেতি (Negation of Negation) সূত্র বস্তুর ধারাবাহিক পরিবর্তনের মূলে কাজ করে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী, প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই রয়েছে পরস্পর-বিরোধী দুটি শক্তি বা প্রবণতা ঃ একটি হল বাদ বা Thesis, অপরটি হল প্রতিবাদ বা Antithesis। এদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যে নতুনতর সমন্বয়ধর্মী অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা হল সম্বাদ বা Synthesis। এই সম্বাদই হল বস্তুর প্রকৃত পরিবর্তন। তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, বস্তুর অন্তর্নিহিত পরম্পরা বিরোধী দুটি শক্তির সংঘর্ষের ফলে বস্তু ও বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটে।

(২) **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) ঃ** মার্কসবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। কার্ল মার্কস মানবসমাজের পরিবর্তনের ইতিহাসকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মধ্যদিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ রচনা

Scanned with CamScanner

করেছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যেখানে বস্তুর অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তি যথা 'বাদ' ও 'প্রতিবাদের' মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কারণে বস্তুর পরিবর্তনের কথা বলে, সেখানে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজের পরস্পরবিরোধী দুটি শ্রেণির যথা সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন শ্রেণি দুটির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের পরিবর্তনের কথা বলে।

মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, দাসযুগে দাস-মালিক ও দাসদের দ্বন্দ্বে সামন্তযুগের সূচনা ঘটে, আবার সামন্তযুগে সামন্তপ্রভু ও সামন্ত প্রজাদের দ্বন্দ্বে পুঁজিবাদী যুগের সূচনা ঘটে এবং পুঁজিবাদী যুগে পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণির দ্বন্দ্বে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। সমাজতন্ত্রের সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজের সকল মানুষই অংশগ্রহণ করে। তাই এখানে সকলেই হল খেটে খাওয়া মানুষ। তাই এখানে মানুষজনের মধ্যে শ্রেণিভেদ থাকবে না; বরং এখানে থাকবে একটিমাত্র শ্রেণি এবং তা হল খেটে খাওয়া শ্রেণি। দুটি পরস্পরবিরোধী দ্বান্দ্বিক শক্তি তথা দ্বন্দ্ব না-থাকায় সমাজতন্ত্রের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। তাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, পরস্পরবিরোধী শ্রেণিদুটির সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের পথ ধরেই সমাজের পরিবর্তন ঘটে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, অর্থনীতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা হল সমাজের 'ভিত্তি' (Base) এবং ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি ভিত্তিস্বরূপ অর্থনীতির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে বলে এরা হল 'উপরি কাঠামো' (Super Structures)। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথা হল এই যে, সমাজের ভিত্তিস্বরূপ অর্থনীতির মালিকানা যতদিন পর্যন্ত কোনো একটি শ্রেণির হাতে থাকে, ততদিন পর্যন্ত সেই শ্রেণির স্বার্থে সাধারণ দরিদ্র শ্রেণির উপর শোষণ-পীড়ন চলে। যতদিন পর্যন্ত শোষণ-পীড়ন চলে, ততদিন শোষিত শ্রেণি শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা দ্বন্দ্ব করে এবং দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম যতদিন পর্যন্ত চলে, ততদিনই সমাজের পরিবর্তন ঘটে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, দাসযুগ, সামন্তযুগ ও পুঁজিবাদী যুগে সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনের মধ্যেকার শ্রেণি সংগ্রামের কারণে তাদের (সেই সব যুগ বা সমাজের) পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সমাজবাদী সমাজে শ্রেণিভেদ না-থাকায় এবং সেই কারণে শ্রেণি সংগ্রামও না-থাকায় এই সমাজের কোনও পরিবর্তন ঘটবে না বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বলা হয়ে থাকে।

(৩) **মূল তত্ত্ব (Theory of Value) :** মার্কসবাদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূল সূত্র হল মূল্য তত্ত্ব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা অনুযায়ী, উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থনীতি হল সমাজের ভিত্তি। কার্ল মার্কস দেখিয়েছেন যে, কোনো কিছুর উৎপাদন করতে চারটি মূল বিষয়ের অবশ্যই প্রয়োজন হয়, যাদের ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়। এদেরকে তাই বলা হয় উৎপাদনের উপাদান। এইগুলি

Scanned with CamScanner

শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব ইত্যাদি। এই সূত্রগুলির সমন্বয়েই মার্কসবাদী তত্ত্বের সুরম্য সৌধটি গড়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই।

(৩) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectial Materialism) ঃ

সূচনা ঃ রাষ্ট্রচিন্তার জগতে কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই মতবাদ অনুযায়ী, বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রবণতার কারণে বস্তু তথা বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই কারণে এই মতবাদ হল বস্তুময় বিশ্বসংসারের উদ্ভব ও বিকাশের চাবিকাঠি স্বরূপ। যোসেফ্ স্ট্যালিন এই মতবাদকে তাই "The world outlook of Marxist-Leninist Philosophy" বা "মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি" বলে চিহ্নিত করেছেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রকৃতি ঃ 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' এই কথাটির মধ্যে দুটি শব্দ আছে, যথা—

(১) দ্বন্দ্বমূলক বা Dialectical এবং

(২) বস্তুবাদ বা Materialism।

(১) **দ্বন্দ্বমূলক ঃ** দ্বন্দ্বমূলক বা Dialectical কথাটি দ্বন্দ্ববাদ বা Dialectics-এই Noun বা বিশেষ্য শব্দটির বিশেষণ। আবার দ্বন্দ্ববাদ বা Dialectics শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ dialego থেকে, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Dialogue। গ্রিক Dialogue অথবা ইংরেজি Dialegoe-এর অর্থ হল পারস্পরিক আলোচনা বা কথোপকথন। অর্থাৎ, সুচিন্তিত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করাই হল Dialego বা Dialogue বা Dialectics বা দ্বন্দ্ববাদের মূল কথা। এদিক থেকে দ্বন্দ্বমূলক বা Dialectical শব্দটি কোনো কিছুর (বস্তুর) অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রবণতার কথাই বলে।

(২) **বস্তুবাদ ঃ** অন্যদিকে বস্তুবাদ বা Materialism বলতে এমন মতবাদকে বোঝানো হয়, যে মতবাদ বস্তুর গুরুত্বকে চরম ও পরম বলে মনে করে। তাই বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তুই (Matter) হল আদি এবং মন (Mind) বা মানসিক ধারণা (Idea) হল বস্তুর অনুবর্তী এবং তা বস্তুর উপরই নির্ভরশীল এবং বস্তুই হল তাই বস্তুজগতের যাবতীয় পরিবর্তনের উৎস। এককথায়, বস্তুবাদ বস্তুকেই একমাত্র গুরুত্ব দিয়ে থাকে

Scanned with CamScanner

এবং বস্তুজগতের পরিবর্তনের একমাত্র উৎস হিসাবে বস্তুকেই চিহ্নিত করে থাকে।

দ্বন্দ্বমূলক ও বস্তুবাদের সম্মিলিত অর্থ ঃ সুতরাং 'দ্বন্দ্বমূলক' ও 'বস্তুবাদ' শব্দ দুটিকে একত্রিত করলে এই অর্থ দাঁড়ায় যে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল এমন একটি মতবাদ, যেটি বস্তুজগতের ক্রমবিকাশে মন বা মানসিক ধারণার চেয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত সংঘাত বা দ্বন্দ্বকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উৎস বলে মনে করে। অর্থাৎ, বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তি আছে ও এদের মধ্যেকার সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের ফলেই বস্তুর পরিবর্তন ঘটে এবং তারই ফলশ্রুতিতে বস্তুজগতেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও পরস্পরবিরোধী প্রবণতা ঃ মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুর স্বাভাবিক প্রবণতা বা 'বাদ' বা 'Thesis' তার কার্যধারায় সর্বদায় এক বিরোধী প্রবণতা বা 'প্রতিবাদ' বা 'Anti-Thesis'-এর জন্ম দিয়ে থাকে এবং যে মুহূর্তে প্রথম স্বাভাবিক প্রবণতা বা বাদের সম্পূর্ণ সাফল্য আসতে থাকে, ঠিক তখনই দ্বিতীয় বিরুদ্ধ প্রবণতা বা প্রতিবাদ তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে এবং এই বাদ ও প্রতিবাদের মধ্যে বিরোধ যখন চরমে ওঠে, তখন এরা উভয়ে নতুন অপর এক সমন্বয়ধর্মী প্রবণতা বা 'সম্বাদ' বা 'Synthesis'-এ মিলিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুর অন্তর্নিহিত এই দ্বান্দ্বিক প্রবণতার কারণেই বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটে চলেছে বলে মার্কসবাদ মনে করে। তাই এই মতবাদ অনুযায়ী "The conflict of opposite interests leads to greater truth and reality" বা "বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বই বৃহত্তর সত্য ও বাস্তবতাকেই সূচিত করে।"

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্য ঃ মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে দেখতে পারি। যথা—

(১) আমাদের সামনেকার এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হল বস্তুজগৎ এবং এই বস্তুজগতের বস্তুগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তারা মোটেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়।

(২) বস্তুজগতের বস্তুগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থাৎ, এরা ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

(৩) বস্তুর এই পরিবর্তন তার অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রবণতার সংঘর্ষের কারণে ঘটে থাকে। বস্তুর প্রতিটি স্বাভাবিক প্রবণতা হল 'বাদ' বা 'Thesis' এবং এর বিরুদ্ধ প্রবণতা হল 'প্রতিবাদ' বা 'Anti-Thesis'। 'বাদ' এবং 'প্রতিবাদের' মধ্যে সংঘর্ষের ফলে বস্তু 'সম্বাদ' বা 'Synthesis'-এ পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, সম্বাদে বস্তু নতুন রূপ বা পরিবর্তিত আকার ধারণ করে।

(৪) বস্তুজগতের বস্তুগুলির পরিবর্তন আকারগত বা পরিমাণগত দিক থেকে গুণগত দিকেই ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন আসে বস্তুর অন্তর্নিহিত ও বাহ্যশক্তির প্রভাবের ফলেই যখন বস্তুর মৌলিক পরিবর্তন ঘটে; যেমন জল তার বাহ্যশক্তি উত্তাপের প্রভাবে বাষ্পে পরিণত হয়। আবার সেই জলই ক্রমশ ঠান্ডা হতে থাকলে তা বাষ্পে বা বরফে পরিণত হয় এবং সেক্ষেত্রে জলের মৌলিক সত্তা বা ধর্ম, যা হল জলত্ব বা

Scanned with CamScanner

তরলতা তা বাষ্পে বা বরফে আর বজায় থাকে না। জলের তরলত্বজনিত মৌলিকত্বের বা মূল চরিত্রের এই পরিবর্তনকেই জলের আকারগত দিক থেকে গুণগত দিকের পরিবর্তন বলে।

(৫) বস্তুজগতের বস্তুগুলি একে অপরের বিনাশ সাধনের দ্বারা বিকশিত ও প্রগতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। বিনাশ ও পরিবর্তনের ক্রমপর্যায়ের পূর্বে বিনাশ প্রাপ্ত পুরোনো বস্তু আবার আত্মসংস্কার ও আত্মউন্নয়নের দ্বারা নতুন বস্তুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। এই পদ্ধতিকেই মার্কস 'অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি' বা 'পরিহারকারীর পরিহার' বা 'নেতির নেতি' বা 'Negation of Negation' বলে চিহ্নিত করেছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন, শ্রেণিবিভক্ত দাস সমাজের আবির্ভাবের ফলে পূর্বেকার শ্রেণিহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজের অবসান ঘটে। আবার শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী যুগে সর্বহারা শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে পূর্বেকার একেবারে আদিপর্বের সেই আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা আদিমতা বা বর্বরতাকে বর্জন করে সংশোধিত আকারে সমাজবাদ বা সাম্যবাদ রূপে আবির্ভূত হয়ে শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজকেই বিলুপ্ত করবে।

এইসব বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে কার্ল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুপম বিশিষ্টতা লাভ করেছে। এই মতবাদের মধ্য দিয়ে মার্কস যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, মানবসভ্যতার প্রগতি কখনও সহজ-সরল পথে আসে না, বরং তা আসে জটিল ও দ্বান্দ্বিক পথপরিক্রমার মধ্য দিয়েই। এই কারণে এমিলি বার্নস্ (Emili Burns) মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে অনুধাবন করার ব্যাপারে একান্তই সহায়ক বলে মনে করেন।

সমালোচনা ঃ মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বক্তব্যের নিপুণতায় সুগভীর হলেও তা কিন্তু নানা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যথা—

(১) সমালোচকগণ মনে করেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কার্ল মার্কসের মৌলিক রচনা নয়। মার্কস, জার্মান দার্শনিক হেগেলের কাছ থেকে 'দ্বন্দ্ববাদ'-সংক্রান্ত ধারণা এবং অপর এক জার্মান দার্শনিক ফুয়েরবাকের কাছ থেকে 'বস্তুবাদের' ধারণা লাভ করেছেন। তাছাড়া ফরাসি সমাজবাদ ও ব্রিটিশ অর্থনীতির বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনাকেও তিনি তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ধারণায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। এইসব উৎসের মধ্য দিয়ে মার্কস তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। তাই তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কোনোমতেই তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়, বরং বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত ঋণের সমষ্টি মাত্র।

(২) সমালোচকগণ মনে করেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ স্ববিরোধিতার প্রকোপে ভুগছে। কারণ এই মতবাদে কার্ল মার্কস একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন— তিনি বলেছেন যে, ইতিহাস 'সর্বদায় পূর্বনির্ধারিত; ফলে ইতিহাসকে নির্ধারণ করা বা রূপদান করার ক্ষেত্রে মানুষের কোনো মৌলিক ভূমিকা নেই। মার্কস আবার এই কথাও বলেছেন যে, মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং নিজের ভাগ্যকেই

Scanned with CamScanner

নিজেই রূপ দান করে। এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের স্ববিরোধিতাকেই প্রকাশ্যে তুলে ধরে।

(৩) বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন, মার্কসীয় বস্তুবাদের ঐতিহাসিকতা তথা বাস্তবতাকে পরীক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। কারণ সমস্ত প্রকার ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে শুধুমাত্র দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি বলে প্রমাণ করার খুব একটা কার্যকর উপায় নেই। বস্তুতপক্ষে, সমস্ত প্রকার ব্যাপক ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে শুধুমাত্র দ্বান্দ্বিক ক্রমবিকাশের ফসল বলে কোনোমতেই দেখা যেতে পারে না।

এই সমস্ত দিক থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে।

মন্তব্য ঃ কিন্তু তবু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গুরুত্বকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারি না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতকে আলোকিত করার ব্যাপারে এই তত্ত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে এমিলি বার্নস উচ্চ প্রশংসার সাথে স্বীকার করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী, বস্তুর অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী দ্বান্দ্বিক প্রবণতা দুটির সংঘর্ষের ফলেই বস্তুর পরিমাণগত দিক থেকে উদ্ভূত গুণগত পরিবর্তনের মধ্যেই নিহিত থাকে বস্তুজগতের পরিবর্তন তথা ক্রমবিকাশের মূল চাবিকাঠিটি। এদিক থেকে বস্তু-সমাজের পরিবর্তনের ইতিহাসকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যথার্থই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তথা বাস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই এই মতবাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

(৪) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

সূচনা ঃ মানব-সমাজের গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণে কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনন্যসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। এই মতবাদ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে মানব-সমাজের ক্রমবিকাশকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পর্যালোচনা করেছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী, প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তি বা প্রবণতা আছে। বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি বা প্রবণতা হল 'বাদ' বা 'Thesis' এবং বিরুদ্ধ শক্তি বা প্রবণতাটি হল 'প্রতিবাদ' বা 'Anti-Thesis' এবং এই 'বাদ' ও 'প্রতিবাদের' মধ্যে সংঘর্ষের ফলে গড়ে ওঠে এক মহাসমন্বয়ধর্মী প্রবণতা, যা হল 'সম্বাদ' বা 'Synthesis'। এই সম্বাদই হল বস্তুর পরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ, সম্বাদেই বস্তুর পরিবর্তনের পূর্ণতা ঘটে থাকে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই পরম সত্যটিকে মানুষের সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে প্রয়োগ করে কার্ল মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্ব রচনা করেছেন।

কার্ল মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বে দেখাতে চেয়েছেন যে, দাসযুগে দাস ও দাসমালিকদের মধ্যেকার সংঘর্ষ সামন্তসমাজের সূচনা করেছে। আবার সামন্তসমাজে সামন্তপ্রভু ও প্রজাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ পুঁজিবাদী সমাজের সূচনা করেছে এবং পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও সর্বহারাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ সমাজবাদী সমাজ সূচিত করবে। এইভাবে কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে দেখাতে চেয়েছেন যে, পরস্পর-বিরোধী দুটি শ্রেণির মধ্যেকার দ্বন্দ্বের পথ ধরে মানবসমাজের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ ঘটে চলেছে।

Scanned with CamScanner

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী অর্থনীতি বা উৎপাদনব্যবস্থা হল সমাজের মূলভিত্তি বা 'Base' এবং এই অর্থনীতি নামক ভিত্তিটার উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়। তাই এরা হল সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা 'উপরি কাঠামো' বা 'Super Structures'।

মার্কস মনে করেন, অর্থনীতি ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। অর্থনীতির মূল কথাই হল উৎপাদন ও বণ্টন। উৎপাদন না হলে সমাজের মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। উৎপাদন তথা অর্থনীতি ছাড়া সমাজ এক পাও এগোতে পারে না, যেমন না খেয়ে মানুষ তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। খাওয়া যেমন মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য, ঠিক তেমনি গোটা সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য হল উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনীতি। তাই অর্থনীতিই হল সমাজের মূলভিত্তি বা 'base' যার উপরই দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র মানবসমাজ। কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয় সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে 'অর্থনীতির' মতো ততটা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় নয়। এরা সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হলেও কোনোমতেই এরা অর্থনীতির মতো অপরিহার্য নয়। বরং এরা হল সমাজের ভিত্তিস্বরূপ অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকা 'উপরি কাঠামো বা Super Structures। মূলত এরা 'অর্থনীতি' নামক ভিত্তিটির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে বলে এদের 'উপরি কাঠামো' বলা হয়ে থাকে।

সমাজ, অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা ঃ কার্ল মার্কস মনে করেন, সমাজের অর্থনীতি গড়ে ওঠে উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ, উৎপাদন ব্যবস্থাই হল অর্থনীতির জীবনীশক্তি তথা হৃৎস্পন্দন। সাধারণভাবে 'উৎপাদন' বা 'Production' বলতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উদ্ভাবনকেই বোঝায়। বস্তুতপক্ষে উৎপাদন বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক শক্তি বা সামগ্রীর উপর মানবিক শ্রম আরোপ করে কোনো কিছু অর্জন বা উদ্ভাবনকেই। উৎপাদনের আবার দুটি দিক আছে, যথা—

(১) উৎপাদন সম্পর্ক এবং (২) উৎপাদিকা শক্তি।

(১) উৎপাদন সম্পর্ক ঃ কোনো একজন ব্যক্তির একার পক্ষে কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। উৎপাদন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিসমূহের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকেই উৎপাদন সম্পর্ক বা Production Relation বলা হয়ে থাকে। এই সম্পর্ক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সাথে শ্রমিকের এবং শ্রমিকের সাথে মালিকের মধ্যে বজায় থাকে।

(২) উৎপাদিকা শক্তি ঃ অন্যদিকে 'উৎপাদিকা শক্তি' বলতে শ্রমিক ও তার শ্রমশক্তি, শ্রমকৌশল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় ছাড়া কোনো দ্রব্যের উদ্ভাবন আদৌ সম্ভব হয় না, তাদেরকেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, উৎপাদিকা শক্তি হল সেইসব শক্তি, যেগুলি উৎপাদনের কাজে একান্তই অপরিহার্য এবং যেগুলি ছাড়া উৎপাদন একেবারেই অসম্ভব।

Scanned with CamScanner

বলাই বাহুল্য, উৎপাদন, উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তিকে নিয়েই গড়ে ওঠে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সমাজের অর্থনীতি এবং অর্থনীতিই গোটা সমাজের অস্তিত্বের সূচক ও নির্ধারক। বস্তুত অর্থনীতিই সমাজকে বজায় রাখে। অর্থনীতি ছাড়া সমাজের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা কোনোমতেই সম্ভব নয়। এই কারণেই 'অর্থনীতিই' হল সমাজের মৌলিক ভিত্তি তথা প্রাণকেন্দ্র।

উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজের বিকাশ ঃ কার্ল মার্কস উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজ ব্যবস্থার প্রথম স্তর আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদিকা শক্তি বা উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা সমগ্র সমাজের হাতেই গচ্ছিত বা কেন্দ্রীভূত ছিল। সেই সময় উৎপাদিকা শক্তি ছিল পাথরের অস্ত্রাদি ও তির-ধনুক। কিন্তু কালক্রমে উৎপাদনের মালিকানাকে সংখ্যালঘু বলশালী জনগণ নিজেদের দৈহিক বলের দ্বারা অধিকার করে নেয় এবং সংখ্যাগুরু দুর্বল জনগণকে নিজেদের দাসে পরিণত করে। এইভাবে দাসযুগের সূচনা ঘটে।

দাসযুগ থেকে সামন্তযুগ ঃ দাসযুগ পাথরের হাতিয়ারের পরিবর্তে ধাতুনির্মিত হাতিয়ার গড়ে ওঠে এবং এই যুগে পশুপালন, চাষবাস ও হস্তশিল্পের প্রচলন ঘটে। এই যুগে সম্পত্তিবান দাসমালিকরা উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে নিজেদের দখলে রেখে তাদের স্বার্থে দাসদের অমানবিক শ্রম করতে বাধ্য করে, তাদের সীমাহীনভাবে শোষণপীড়ন করতে থাকে। মালিকদের শোষণ-পীড়নে অসহ্য হয়ে অবশেষে দাসরা মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। মালিকদের বিরুদ্ধে দাসদের এই সংঘটিত বিদ্রোহের পথ ধরে দাস সমাজের অবসান ঘটে এবং সামন্ত সমাজ গড়ে ওঠে।

সামন্তযুগ থেকে পুঁজিবাদী যুগ ঃ সামন্ত সমাজের উৎপাদনের শক্তি বা হাতিয়ারের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। এই হাতিয়ার ছিল প্রধানত ধাতুনির্মিত হাতিয়ার বা ধাতব শক্তি। এই যুগে লোহার ব্যবহারও শুরু হয়েছিল। এই যুগে মুষ্টিমেয় সামন্তপ্রভুদের হাতে সমস্ত জমি তথা অর্থনীতির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় তারা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিদাসদের জমিকেন্দ্রিক উৎপাদন কাজে শোষণ করত। এই শোষণকে প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে নিলেও পরবর্তীকালে এই শোষণে বিপর্যস্ত হয়ে এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভূমিদাস বা সামন্তপ্রজারা সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে এবং এই সামন্ত-বিদ্রোহের পথ ধরেই অবশেষে সামন্তযুগের অবসান ঘটে ও পুঁজিবাদী যুগ সূচিত হয়।

পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদী যুগ ঃ আধুনিক পুঁজিবাদী যুগে নতুন নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এর ফলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগণ অনাহারে মৃত্যু এড়ানোর জন্য পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের কারখানায় নিযুক্ত হয়ে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয়

Scanned with CamScanner

করতে বাধ্য হয় এবং তার মাধ্যমে তারা মালিকদের শোষণের শিকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শিল্পপতি বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের অতিরিক্ত শ্রমজাত পণ্যদ্রব্য থেকে উপার্জিত উদ্‌বৃত্ত মূল্য থেকে শ্রমিকদেরকেই বঞ্চিত করতে থাকে। ফলে তারা আর এক দফা শোষণের মুখে পড়ে। প্রথম দিকে শ্রমিকরা মালিকদের শোষণ-বঞ্চনা স্বীকার করে নেয় বটে। তবে পরবর্তীকালে শোষণপীড়নে চূড়ান্তভাবে অসহ্য হয়ে ওঠায় এবার সর্বহারা শ্রমিকরা বিপ্লব সংঘটিত করবে, শোষক-বুর্জোয়া মালিকদের পরাস্ত করবে, তাদের হাত থেকে যাবতীয় ক্ষমতা দখল করবে এবং তার মাধ্যমে তারা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বা সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে বলে কার্ল মার্কস্ মনে করেন।

সর্বহারা একনায়কতন্ত্র ও সমাজের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঃ কার্ল মার্কস বিশ্বাস করেন যে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বা সমাজবাদের উৎপাদন সম্পর্কে দেখা দেবে আন্তরিকতা বা মমত্ববোধ এবং এখানে উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের হাতে থাকবে ও সকলেই সেই সামাজিকীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থার অংশগ্রহণ করে সুস্থ ও সুষম জীবনযাপন করবে। ফলে এখানে শ্রেণিভেদ থাকবে না, অর্থাৎ থাকবে না উৎপাদনব্যবস্থার মালিক ও মালিকানাহীন শ্রেণি দুটির অস্তিত্ব। বরং এখানে থাকবে শুধু একটিই শ্রেণি, তা হল খেটে খাওয়া মানুষ শ্রেণি বা মানবজাতি এবং সকল মানুষই এখানে সামাজিক উৎপাদনে অংশ নিয়ে জীবনধারণের উপযোগী প্রাপ্য অংশ বা Share লাভ করবে ও সুস্থ জীবনযাপন করবে। তাই এই সমাজের দুটি মূল নীতি হল ঃ "যে খাটবে সে খাবে" এবং "প্রত্যেকে তার সাধ্যমতো শ্রম করা প্রয়োজনমতো প্রাপ্য পাবে।" এই দুটি নীতিই সর্বহারার একনায়কতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রে সকল মানুষের জীবনযাত্রাকে সুস্থ, সুষম ও সুনিশ্চিত করে তুলবে।

বৈশিষ্ট্য বা মূল কথা ঃ এইভাবে কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রেক্ষাপটে মানবসমাজের ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ক্রমবিকাশকে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন—

(১) উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থনীতি হল সমাজের ভিত্তি।

(২) এই অর্থনীতি নামক ভিত্তিটির মালিকানা যতদিন পর্যন্ত কোনো একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সেই মালিকানাভোগী শ্রেণিটি নিজের প্রাধান্যের স্বার্থে অর্থনীতির মালিকানাহীন অপর শ্রেণিটিকে উৎপাদন কাজে শোষণ করবে।

(৩) যতদিন পর্যন্ত উৎপাদনকেন্দ্রিক এই শোষণ চলবে, ততদিন পর্যন্ত শোষিত শ্রেণিটি শোষক শ্রেণিটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা বিপ্লব করবে।

(৪) যতদিন পর্যন্ত শ্রেণিবিপ্লব চলবে, ততদিন পর্যন্ত সমাজের পরিবর্তন ঘটবে। যেমন শ্রেণিবিপ্লবের পথ ধরে দাসযুগ, সামন্তযুগ ও পুঁজিবাদী যুগের পরিবর্তন ঘটেছে।

(৫) যখন সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানাকে কেন্দ্র করে শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণিসংগ্রাম বা বিপ্লব ঘটবে না, তখন সমাজের আর কোনো পরিবর্তন ঘটবে না,

Scanned with CamScanner

যেমন সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রে সকল মানুষই সামাজিকীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষে পরিণত হয় বলে এখানে শ্রেণিভেদ, শ্রেণিশোষণ, শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিবিপ্লব না-থাকায় সমাজবাদী সমাজেরও কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

সংক্ষেপে এইটুকু হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মর্মকথা তথা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সমালোচনা ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানবসমাজের ক্রমবিকাশের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক চিত্র উপস্থাপন করলেও এই তত্ত্ব নানাদিক থেকে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়ে থাকে। যথা—

(ক) সমালোচকগণ মনে করেন, কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে একমাত্র অর্থনীতির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ সমাজের ক্রমবিকাশে অর্থনীতির মতো শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি দিকও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যা কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে আদৌ ধরা পড়েনি।

(খ) কার্ল মার্কস মনে করেন, শ্রেণিসংগ্রামের পথ ধরে একদিন না একদিন সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হবেই। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে কার্ল মার্কস অনাগত ইতিহাসের গতিধারাকে নিছক কল্পনার ভিত্তিতে অতিসরলীকরণ করে ফেলেছেন বলে সমালোচকগণ কঠোরভাবে সমালোচনা করে থাকেন।

(গ) সমালোচকগণ মনে করেন, ঐতিহাসিক বস্তুবাদে মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে শুধুমাত্র সংগ্রাম আর বিরোধের ইতিহাস হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে এই মতবাদ মানুষের চরিত্রের স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ দিককে উপেক্ষা করে তার চরিত্রে কুটিল দিকটিকেই শুধু তুলে ধরেছেন।

এই সমস্ত দিক থেকে মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

মন্তব্য ঃ এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গুরুত্বকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারি না। কারণ এই তত্ত্বই এতকালের রাজরাজরা বীরত্ব ও সংগ্রামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ একপেশে ইতিহাসের পরিবর্তে আপামর মানুষজনের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ যথার্থ সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ডারউইন যেমন জীবজগতের বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, ঠিক তেমনি কার্ল মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানবসমাজের বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম। এখানেই নিহিত রয়েছে কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বের সুমহান তাৎপর্য।

(৫) মার্কসের শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব (The Theory of Class and Class Struggles of Marx)

সূচনা ঃ শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বটি হল মার্কসীয় রাজনৈতিক দর্শনের এক উজ্জ্বল দিকচিহ্ন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক ...

Semester- IV

Paper- C-8

Unit : 6 → Bentham : Utilitarianism → উপযোগিতাবাদ → মূল নীতি → উপযোগিতা (Utility)

Utilitarian → (হিতবাদী)

Q) বেন্থামকে হিতবাদী দার্শনিক কেন বলা হয়? অথবা — বেন্থামের উপযোগিতাবাদকে স্থূল কেন বলা হয়?

Neelgagan

Scanned with CamScanner

প্রথম Answer → ...ground) :

জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২ খ্রিঃ) ১৭৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের প্রায় সমস্তটাই কেটেছিল ইংল্যান্ডের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা সম্পন্ন রাজা তৃতীয় জর্জ-এর রাজত্বকালে। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই ছিলেন আইনব্যবসার সঙ্গে জড়িত। স্বভাবতই বেনথামের বাল্যকাল কেটেছিল আইনের পরিবেশে। চার বছর বয়সের আগেই তিনি ল্যাটিন ভাষা শেখেন এবং ছয় বছর বয়সে ফরাসি ভাষা শেখেন। আট বছর বয়সে তিনি ভলটেয়ারের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সে প্রমাণও আছে। ১৭৬৯ সালে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাস করেন। কিন্তু ব্যারিস্টারিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ না করে তিনি লেখালেখিতেই সারা জীবন ধরে আত্মনিয়োগ করেন। ১৭৬২ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তাঁর আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং লন্ডন শহরে একটি বাড়ি নির্মাণ করে সেখানেই তিনি অকৃতদার থেকে সারা জীবন কাটিয়ে দেন।

বেনথাম ছিলেন ইংল্যান্ডের এক ক্রান্তিলগ্নের রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ। আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ইংল্যান্ডে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের পরিণামে

Scanned with CamScanner

বেনথামকে *হিতবাদী* (Utilitarian) দর্শনের জনক হিসাবে ইতিহাস স্বীকৃতি দিয়েছে। এই দর্শন মূলত উপস্থাপিত হয়েছে বেনথামের *'প্রিন্সিপিল্‌স অফ মরাল্‌স অ্যান্ড লেজিসলেশন'* গ্রন্থে। এখানে দেখা যায় যে, বেনথামের হিতবাদী দর্শনের মূল ভিত্তি হল তাঁর উপযোগিতা (utility)-র সূত্র। তিনি তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই এই উপযোগিতার সূত্র বর্ণনা করেছেন এইভাবে ঃ "প্রকৃতি মানুষকে দুঃখ ও সুখ এই দুই সার্বভৌম নিয়ন্তার শাসনে রেখেছে। তারাই স্থির করে দেয় আমাদের কী করা উচিত এবং কী আমরা করব। .....তারা আমাদের শাসনে রাখে আমাদের সব কাজকর্মে, আমাদের সকল চিন্তায়।"[১] অতঃপর উপযোগিতা সূত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এইভাবে ঃ "উপযোগিতার সূত্র বলতে বোঝায় সেই সূত্রকে যা যার স্বার্থ জড়িত তার সুখ বাড়ানোর বা কমানোর প্রবণতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি কাজ অনুমোদন বা নামঞ্জুর করে, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, যা সুখ বর্ধন করছে না তার বিরোধিতা করছে।"[২] তিনি আরও বলেছেন, "এই সূত্র শুধু ব্যক্তির কাজের ক্ষেত্রেই

Scanned with CamScanner

সীমাবদ্ধ নয়, তা প্রযোজ্য সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও।”[১] এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে সমাজের কথা। এ কথা মনে রেখে বেনথাম সমাজের ক্ষেত্রে উপযোগিতার সূত্র কীভাবে প্রযোজ্য হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজ একটি ‘কাল্পনিক সংস্থা’[২]। আসলে তা হল ব্যক্তিমানুষের সমষ্টি মাত্র। কাজেই সমাজের স্বার্থ ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও জিনিস ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা করে তখন যখন তা তার সুখ-সমগ্রের সঙ্গে নতুন কোনও সুখ যোগ করে অথবা যখন তা তার দুঃখের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। একইভাবে সমাজের ক্ষেত্রে একটি কাজকে উপযোগিতার সূত্রের অনুসারী বলা যায় তখন যখন তা সমাজের সুখ না কমিয়ে তা বাড়ায়।

বেনথাম তাঁর উপযোগিতার সূত্রকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন এবং এইজন্য তিনি তাঁর ‘*প্রিন্সিপিল্‌স অফ মরাল্‌স অ্যান্ড লেজিসলেশন*’-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সূত্রের বিরোধী নীতিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, উপযোগিতার বিরোধী নীতি হল *ত্যাগব্রত* (asceticism)—যা উপযোগিতা সূত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং *সহানুভূতি* (sympathy) ও *বিরাগ* (antipathy)—যা কখনও উপযোগিতা সূত্রের বিরোধিতা করে,আবার কখনও বিরোধিতা করে না।[৩] ত্যাগব্রত উপযোগিতা সূত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। যা সুখবর্ধন করে তাকে তা খারিজ করে আর যা সুখ কমায় তাকে তা অনুমোদন করে। ত্যাগবাদ সম্পর্কে বেনথামের অভিমত এই যে, নীতিবাদী ও ধর্মবাদীরা এই ব্রতের প্রবক্তা হলেও এই নীতি সরকারের কাজকর্মে আদৌ প্রযোজ্য নয়। এছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নীতি সঙ্গতি বজায় রেখে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। বস্তুত, ‘‘পৃথিবীর এক-দশমাংশ মানুষও যদি এই নীতি সুসমঞ্জস ভাবে অনুসরণ করতে পারত তাহলে এক দিনের মধ্যেই তারা পৃথিবীকে নরকে পরিণত করতে পারত।”[৪] বেনথাম আরও মনে করেন যে, যাঁরা ত্যাগবাদের প্রবক্তা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে চান যে, অন্যেরা তাঁদের অনুকূলে ত্যাগ স্বীকার করুক। উপযোগিতা সূত্রের দ্বিতীয় বিরোধী নীতি সম্পর্কে বেনথামের বক্তব্য এই যে, এই নীতি অনুযায়ী মানুষ কোনও কিছু গ্রহণ করে বা বর্জন করে সুখের পরিমাণ বাড়াতে বা দুঃখের পরিমাণ কমাতে নয়, তার মন চায় বলেই সে এই গ্রহণ বা বর্জনে আগ্রহী হয়। এখানে কোনও বিষয়গত বা বাস্তব বিবেচনা কাজ করে না। এই কারণেই বেনথাম এই নীতিকেও অগ্রাহ্য করেছেন।

---

১. ... private individual, but of every measure ...

এইভাবে বেনথাম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মানুষের সর্ববিধ কাজের একমাত্র উপযুক্ত ভিত্তি হল উপযোগিতার বিবেচনা। বেনথাম আরও বলেছেন যে, ভাবপ্রবণ ত্যাগবাদী নৈতিকতা অভিজাত শাসনের ফল এবং তা শুধু শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে।

বেনথামের এইসব বক্তব্য থেকে সঙ্গাতভাবেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে, বেনথাম-বর্ণিত সুখ কোনও অধিবিদ্যক বা অতীন্দ্রিয় সুখ নয়, তা রক্তমাংসের মানুষ যে সুখ চায় সেই সুখ, অর্থাৎ, ব্যবহারিক জীবনের পার্থিব সুখ। আরও বোঝা যায়, এই সুখের গুণগত উৎকর্ষ বেনথামের কাছে ধর্তব্য বিষয় নয়, তাঁর কাছে সুখের পরিমাণ কতটা তাই-ই বিচার্য বিষয়। অর্থাৎ, সুখের উৎস যাচাই করে তার গুণের বিচার করার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে বেনথাম মনে করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে শিশুরা পুশপিন (pushpin) খেলে যে আনন্দ পায় তার সঙ্গো যিনি কবিতা পড়েন বা লেখেন তাঁর আনন্দের কোনও পার্থক্য নেই। যে কোনও সুখই ভালো এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণের সুখ হল সবচেয়ে ভালো। কাজেই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল সবচেয়ে বেশি পরিমাণের সুখ লাভ এবং যথাসম্ভব দুঃখ বর্জন। অর্থাৎ, সুখের পরিমাণগত বৃদ্ধির নিরিখে মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার, তার চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিকের বিচার করতে হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বেনথামের মতে, সুখ ও দুঃখ পরিমাপযোগ্য। এখন প্রশ্ন হল, এই পরিমাপ করা যাবে কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বেনথাম এইভাবে ঃ "সুখ ও দুঃখ বেশি হবে না কম হবে তা নির্ভর করে সাতটি অবস্থার উপর—(১) *তীব্রতা* (intensity), (২) *স্থায়িত্ব* (duration), (৩) *নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তা* (certainty or uncertainty), (৪) *নৈকট্য অথবা দূরত্ব* (propinquity or remoteness), (৫) *উর্বরতা* (fecundity), (৬) *অকৃত্রিমতা* (purity) এবং (৭) *ব্যাপ্তি* (extent)।"[১] এইসব মানদণ্ডের ভিত্তিতে সুখ ও দুঃখের পরিমাণ নির্ধারণ করার পর যদি দেখা যায় যে, সুখের পরিমাণ দুঃখের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি তাহলে মানুষের আচরণ ও কাজ ভালো এবং নৈতিক বলে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে এই তুলনা করার পর যদি দেখা যায় যে, সুখের তুলনায় দুঃখের পরিমাণ অনেক বেশি তাহলে মানুষের আচরণ ও কাজ মন্দ এবং অনৈতিক হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে, যেহেতু বেনথাম সুখের পরিমাপযোগ্যতায় বিশ্বাসী সে কারণে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সুখ লাভই ব্যক্তিজীবনের অন্তিম লক্ষ্য। অন্যদিকে যেহেতু বেনথামের মতে সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয় সেজন্য তাঁর মতে, সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখোৎপাদনই হল সমাজের অন্তিম লক্ষ্য। আবার, বেনথামের বিচারে সুখের মাধ্যমেই সূচিত হয় নৈতিক মঙ্গাল। কাজেই তাঁর হিতবাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল সংখ্যাধিকজনের সর্বোচ্চ পরিমাণ হিত সাধন (*greatest*

১. "......it will be greater or l... ...stances......(i) its

good of the greatest number) এবং একইসঙ্গে তা সমাজের সামাজিক এবং নৈতিক লক্ষ্যও বটে।

বেনথাম সুখ ও দুঃখের চারটি উৎস চিহ্নিত করেছেন—এগুলি হল *প্রাকৃতিক নিয়মসম্মত* (physical), *রাজনৈতিক* (political), *নৈতিক* (moral) এবং *ধর্মীয়* (religious)। যে সুখ-দুঃখের পিছনে অন্য কারোর হাত নেই, যা স্বাভাবিক ভাবেই একজন ব্যক্তির জীবনে দেখা দিচ্ছে তাকে বেনথাম বলেছেন প্রাকৃতিক নিয়মসম্মত। যখন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শাসকের ইচ্ছায় বা নির্দেশে ব্যক্তির জীবনে সুখ-দুঃখ দেখা দেয় তখন তার উৎস হল রাজনৈতিক। যখন কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নয়, কিছু ব্যক্তি একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হয়ে তাকে সুখ-দুঃখ দেয় তখন, বেনথামের মতে, তা হল নৈতিক। অন্য দিকে এক অদৃশ্য পরম শক্তির ইচ্ছায় যখন মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ নেমে আসে তখন তা ধর্মীয়।

এখন প্রশ্ন হল, প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি তার সর্বোচ্চ হিত সাধনে তৎপর হয়, তাহলে তার ব্যক্তিগত হিতের সঙ্গে সামাজিক হিতের বিরোধিতার সম্ভাবনা দূর করা যাবে কীভাবে? অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক-স্বার্থের সঙ্গে সমন্বিত করা যাবে কীভাবে? এই প্রশ্ন বেনথাম এড়িয়ে যান নি, তিনি উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর '*ডিঅনটোলোজি অর সায়েন্স অফ মরালিটি*' ('*Deontology or Science of Morality*') গ্রন্থে বলেছেন, আত্মস্বার্থকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা এক অনৈতিক কাজ। বুদ্ধিমান নীতিবাদীর অন্যতম উদ্দেশ্য হল মন্দ ব্যক্তি যেভাবে সুখ-দুঃখের ভুল হিসাব করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। বেনথাম আরও বলেছেন, "প্রকৃতির প্রাথমিক নিয়ম অনুযায়ী আমরা নিজের সুখ কামনা করি এবং বিজ্ঞতা ও বদান্যতা তার সঙ্গে যোগ করে এই অনুশাসন ঃ অন্যের সুখ কামনা করো—নিজের সুখের সন্ধান করো অন্যের সুখে।"[১]

বেনথাম স্বীকার করেছেন যে, ব্যক্তিগত সুখ এবং সংখ্যাধিক জনের সুখ অনেক সময় অভিন্ন হয় না, তাদের মধ্যে ব্যবধান থাকতেই পারে। তাঁর মতে, এই ব্যবধান দূর করার দুটি উপায় আছে। একটি হল শিক্ষা। বেনথামের মতে, শিক্ষা মানুষের মনকে উন্নত করে যার ফলে সে বুঝতে শেখে যে, যুক্তির আলোকে আত্মসুখকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তারই মধ্যে নিহিত আছে অপরের জন্য সদিচ্ছা, সহানুভূতি এবং বদান্যতা। দ্বিতীয় উপায় হল এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে মানুষের আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক আবেগ প্রবাহিত হবে সামাজিক লক্ষ্যের দিকে। এর ফলে মানুষের আত্মস্বার্থ কখনোই অন্যের ক্ষতি করবে না। এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের প্রসঙ্গেই বেনথাম আগ্রহী হয়েছেন

... happiness; and the united voices

রাষ্ট্রের আলোচনায়। এইভাবে দর্শনের পথ পরিক্রমা করে বেনথাম উদ্যোগী হয়েছেন রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায়।

Scanned with CamScanner

পরিপ্রেক্ষিতেই।

বেনথামের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে, উপযোগিতার স্রষ্টা না হলেও তিনি নিঃসন্দেহে ছিলেন *উপযোগিতাবাদ* (Utilitarianism)-এর স্রষ্টা। উনিশ শতকীয় ইংল্যান্ডে তাঁর এই উপযোগিতাবাদকে কেন্দ্র করে তিনি এক বিদগ্ধ দার্শনিক গোষ্ঠীর জন্ম দেন। শুধু তাই নয়। উপযোগিতাবাদের বহুল প্রচার ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮২৪ সালে '*ওয়েস্টমিন্স্টার রিভিউ*' ('*Westminster Review*') নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ থেকেই বোঝা যায়, নিজের প্রণীত তত্ত্বের প্রতি বেনথামের প্রবল অঙ্গীকার ছিল এবং বোধ করি, এটি অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, উপযোগিতাবাদ বেনথামের কাছে শুধু দার্শনিক তত্ত্বই ছিল না—তা একই সঙ্গে ছিল তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শও।

Scanned with CamScanner

(Notes material given by Dr. Amrita Banerjee)

Semester-IV

Paper - C-8 Modern Western Pol. Thought.

Unit - 7: J.S. Mill: Utilitarianism and Liberalism.

Utilitarianism → "উপযোগিতাবাদ"
Liberalism → "উদারনীতিবাদ"

Q1.) জন স্টুয়ার্ট মিল এর উপযোগিতাবাদ কি ছিলো? অথবা/- স্টুয়ার্টের এর হিতবাদ তত্ত্ব থেকে বেন্থামের হিতবাদ পার্থক্য কোথায় তা আলোচনা কর।

Q2.) মিলের (জন স্টুয়ার্ট মিল) উদারনীতিবাদ কি?

Neelgagan

Scanned with CamScanner

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রেক্ষাপট (Background) ঃ

জেম্‌স মিল ছিলেন ইংল্যান্ডের এক প্রখ্যাত হিতবাদী দার্শনিক। জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রিঃ) হলেন তাঁরই পুত্র। জন্ম লন্ডন শহরে। জেম্‌স মিল ছিলেন সামগ্রিক শিক্ষায় বিশ্বাসী এবং তিনি মনে করতেন স্কুল-কলেজের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এই সামগ্রিক শিক্ষা সম্ভব নয়। তাই তিনি সন্তান মিলের শিক্ষার ভার তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে। বস্তুত, শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা-ভাবনা ছিল তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করতে চেয়েছিলেন পুত্র মিলের শিক্ষার মধ্য দিয়ে। তাই আশ্চর্য নয়, পিতার কাছে মিলের শিক্ষা শুরু হয় শৈশবের গোড়ায়। তিন বছর বয়সে তিনি গ্রিক ভাষা শেখেন এবং ল্যাটিনের পাঠ নেন সাত বছর বয়সে। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্লেটো, হোমার, সোফোক্লিস প্রমুখ গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ করে ফেলেন। একইসঙ্গে তিনি পাটিগণিত এবং প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। আট বছর বয়স থেকে গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্যে মিল বিশেষ দক্ষ হয়ে ওঠেন। এই সময়ে তিনি উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। বারো বছর বয়সে তিনি অধ্যয়ন করেন যুক্তিবিদ্যা। পিতার অনুপ্রেরণায় তেরো বছর বয়সে তিনি **অ্যাডাম স্মিথ** (Adam Smith) ও **ডেভিড রিকার্ডো** (David Ricardo)-র রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন। ১৮২৩ সালে সতেরো বছর বয়সে মিল তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে একজন করণিক হিসাবে। এই পদে তেত্রিশ বছর কাজ করার পর ১৮৫৬-তে তিনি বিভাগীয় প্রধান পদে উন্নীত হন। এর দু'বছর পরে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৫-র সংসদীয় নির্বাচনের সময় ওয়েষ্টমিন্সটার অঞ্চলের একদল ভোটার মিলকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। মিল নির্বাচনে অবতীর্ণ হন বটে, কিন্তু নির্বাচনের জন্য তিনি কোনও অর্থ ব্যয় করেন নি বা নির্বাচনী প্রচারও করেন নি। তথাপি অল্প ভোটের ব্যবধানে রক্ষণশীল দলের প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি সাংসদ পদে নির্বাচিত হন। তবে ১৮৬৮-র নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। এই পরাজয়কে মিল কীভাবে নিয়েছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনীতে যেখানে তিনি বলেছেন, পরাজয়ে তিনি যতটা আশ্চর্য হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি আশ্চর্য হয়েছিলেন তাঁর জয়লাভে।

মিলের লেখনী ছিল অত্যন্ত সচল। কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। *'ওয়েস্টমিন্সটার রিভিউ'* (*'Westminster Review'*) পত্রিকার প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এই পত্রিকায় লিখতে থাকেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৫৯

Scanned with CamScanner

সালে প্রকাশিত '*অন লিবার্টি*' ('*On Liberty*'), ১৮৬১ সালে প্রকাশিত '*দ্য কনসিডারেশন্‌স অন রিপ্রেজেনটেটিভ গভর্নমেন্ট*' ('*The Considerations on Representative Government*') এবং ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত পুস্তিকা '*ইউটিলিটারিয়ানিজম*' ('*Utilitarianism*')। এদের মধ্যে প্রথম দুটিতে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা এবং তৃতীয়টিতে তাঁর দর্শন। লক্ষণীয়, এ সবগুলিই রচিত হয় মিলের ব্যক্তিগত জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর। ১৮৩০ সালে মিলের পরিচয় হয় হ্যারিয়েট হার্ডি টেলর (Harriet Hardy Taylor) নামে এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে। প্রায় প্রথম দর্শনেই মিল তাঁর প্রেমে পড়েন। অচিরেই দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৮৪৯ সালে হ্যারিয়েটের স্বামীর মৃত্যু হলে ১৮৫১ সালে মিল তাঁকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী টেলর ছিলেন এক অতি বুদ্ধিমতী ও চিন্তাশীল মহিলা। তাঁর সান্নিধ্যে ও অনুপ্রেরণায় মিল এক নতুন মানুষ হয়ে ওঠেন। এতদিন পর্যন্ত মিলের মানসলোক ছিল পিতার বৌদ্ধিক আধিপত্যের অধীন। স্বভাবতই পিতার দেখানো পথই ছিল তাঁর পথ এবং পিতার শেখানো বেনথামীয় মতবাদের প্রতি তাঁর ছিল অন্ধ আনুগত্য। কিন্তু এখন থেকে পিতার বৌদ্ধিক অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি জীবন ও জগতকে নতুনভাবে দেখতে থাকেন। তাই, আশ্চর্য নয়, মিলের সব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলিই রচিত হয় তাঁর বিবাহের পরে। বস্তুত, উনিশ শতকীয় ইংল্যান্ডের এক প্রখ্যাত দার্শনিক হিসাবে মিলের উত্থানের পিছনে ছিলেন তাঁর পত্নী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দর্শন (Philosophy) ঃ

যতদিন মিল পিতার বৌদ্ধিক অভিভাবকত্বের অধীনে ছিলেন ততদিন তিনি বেনথামের হিতবাদকে গ্রহণ করেছিলেন বিনা প্রশ্নে। কিন্তু স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় যখন তিনি স্বাধীন মননের অধিকারী হন তখন তিনি বেনথামের হিতবাদকে দেখতে শুরু করেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এবং পরিণামে তিনি বেনথামের হিতবাদকে পরিমার্জন করে তাকে এক নতুন চরিত্র দান করেন। অবশ্য তাঁর '*ইউটিলিটারিয়ানিজম*' সন্দর্ভে তিনি বেনথামীয় হিতবাদের মূল সূত্রটিকে স্বীকার করে নিয়ে শুরু করেছেন। অর্থাৎ, সুখের সন্ধান আর দুঃখকে বর্জনই যে মানুষের স্বাভাবিক নিয়ম বেনথামের এই সূত্রকে তিনি মেনে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, "সুখ ও দুঃখ থেকে মুক্তিই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এবং সকল কাম্য বস্তু কাম্য এই কারণে যে তাদের মধ্যে সুখ নিহিত আছে অথবা তারা সুখোৎপাদনের ও দুঃখবর্জনের মাধ্যম।"[১] এই পর্যন্ত মিল সম্পূর্ণরূপে বেনথামের তত্ত্বের অনুসারী। কিন্তু তারপরেই তিনি বলেছেন, "কোনও কোনও ধরনের সুখ বেশি কাম্য এবং বেশি মূল্যবান এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হিতবাদী সূত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। অন্য সব কিছুর ক্ষেত্রে পরিমাপ করার সময় যখন

১. "......pleasure, and freedom from pain, are the only things desirable as end;

পরিমাণ ও গুণমান উভয়ই বিচার করা হয় তখন সুখের পরিমাপ করার সময় শুধু পরিমাণের উপর নির্ভর করা নিতান্তই এক অবাস্তব পদ্ধতি।"[১] এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, বেনথামের হিতবাদের সঙ্গে মিলের হিতবাদের পার্থক্য কোনখানে। বেনথামের হিতবাদী তত্ত্বের কোনও নৈতিক বা নান্দনিক ভিত্তি নেই। তাঁর কাছে যে কোনও ধরনের সুখই গ্রাহ্য, তা বদহজমির সুখ হোক বা চৌর্যের সুখই হোক। মিল এই স্থূল ও অনৈতিক সুখের ঘোরতর বিরোধী। তাঁর কাছে সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখের কোনই মূল্য নেই যদি তা সর্বোৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন না হয়। তাঁর মতে, মানুষ নিছক পশু নয় যে শুধু নির্বিচারে বস্তুগত লাভের পিছনে ছোটে। নিছক সুখে সে আগ্রহী নয় কারণ সে তার নৈতিক ও যৌক্তিক বিচারবোধ প্রয়োগ করে তার উপভোগের সামগ্রী বাছাই করতে পারে। কাজেই বেনথাম-বর্ণিত সুখ তার কাছে প্রেয় নয়, সে চায় সেই সুখ যা উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন। তা না পেলে সে অসুখী থাকতে আপত্তি করে না। তবু সে বেনথামের মানুষের মতো সুখভোগ করতে চায় না। তার মনুষ্যত্ব এবং নৈতিক বিচারবোধ বজায় রাখাটাই তার কাছে বড়ো কথা, পশুর মতো স্থূল সুখভোগ করা নয়। তাই মিল বলেছেন, "তৃপ্ত শূকরের চেয়ে অতৃপ্ত মানুষ অনেক ভালো। তৃপ্ত মূর্খের তুলনায় অতৃপ্ত সক্রেটিস (গ্রিক দার্শনিক) অনেক ভালো।"[২]

বেনথামের মতো মিলও সর্বোচ্চ সুখকে মানুষের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর চোখে মানুষ এক নৈতিক ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রাণী। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, মানুষের *অন্তর্জাত ভালোত্ব* (intrinsic goodness) আছে। সেজন্য সে নির্বিচারে যে কোনও জিনিসকে গ্রহণ করতে পারে না। তার আছে বাছ-বিচারের অভ্যাস। এই কারণে সে সুখের গুণগত বিচার না করে, যে কোনও ধরনের সুখকে প্রেয় বলে ভাবতে পারে না। যথার্থ মানুষ এবং পরিশীলিত মনের অধিকারী বলেই সে নিশ্চিত হতে চায় যে, যে সুখের পিছনে সে ধাবিত হবে তার গুণগত উৎকর্ষ আছে কিনা। অর্থাৎ, সে সুখলাভের আগে যে উৎস থেকে সুখ উৎসারিত হচ্ছে সেই উৎসটিকে নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করে। বেনথামের হিতবাদের সঙ্গে মিলের হিতবাদের আর এক পার্থক্য এখানেও। বেনথাম সুখের উৎস সন্ধানে আগ্রহী নন। যে কোনও উৎস থেকেই সুখ আসুক না কেন, কতটা সুখ এল তা-ই বেনথামের কাছে বিচার্য বিষয়। অর্থাৎ, বেনথাম ফলাফলে বিশ্বাসী, উৎসে নয়। পক্ষান্তরে মিল বিশ্বাসী উৎসে, ফলাফলে নয়। এই উৎসের সন্ধান করে যে মানুষ সে এক সংস্কৃতিমনস্ক, আত্মসচেতন ও রুচিবান মানুষ যে সমস্ত জাগতিক ও অজাগতিক বিষয়ের নৈতিক বিচার করে তাদের মধ্যে কোনটি ভালো ও কোনটি মন্দ তার মূল্যায়ন

Scanned with CamScanner

করে কোনটি তার নৈতিক আত্মোন্নতির সহায়ক তা নির্ণয় করতে সক্ষম হয় এবং সেটিকেই সে প্রেয় বলে গ্রহণ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মিল যে বেনথামের হিতবাদকে বর্জন করেছেন তার মূল কারণ নৈতিক। বেনথামের হিতবাদে নৈতিকতার কোনও অবকাশ নেই। বেনথামের মানুষ তথাকথিত সুখের দাস। নৈতিক মানদণ্ডের বিচারে কোনও সুখ নিকৃষ্ট বলে মনে হলেও তার তাতে আপত্তি নেই। সুখের পরিমাণ সর্বোচ্চ হলেই সে খুশি, তা সে যে কোনও প্রকৃতির সুখই হোক না কেন। এই প্রেক্ষাপটে যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হল এই যে, বেনথামের হিতবাদ অনৈতিক—অন্যদিকে, মিলের হিতবাদ নৈতিক।

Scanned with CamScanner

উদারনীতিবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সুমহান তাৎপর্য।

৯। মিলের উদারনীতিবাদ : ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয় (Mill's Liberalism : Co-ordination between Individual Liberty and State Authority) :

ভূমিকা : জন স্টুয়ার্ট মিল (J. S. Mill) ছিলেন মূলতঃ একজন উদারনীতিবাদী

Scanned with CamScanner

চিন্তাবিদ। তাঁর উদারনীতিবাদী চিন্তাধারার প্রধান দিকচিহ্নই হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তির স্বাধীনতার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তিকে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। তবেই ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাধীনভাবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে মিলই (J. S. Mill) অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে উদারনীতিবাদী ও হিতবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ অন্যকোন চিন্তাবিদের রচনায় পাওয়া যায় না। ওয়েপার (C. L. Wayper) তাই বলেছেন, 'No finer defence of liberty of thought and discussion has ever been written.' তাই মিলই মূলতঃ ব্যক্তিস্বাধীনতার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষ্যকার।

মিল : ব্যক্তিস্বাধীনতার আধুনিক ভাষ্যকার

মিল তাঁর ***On Liberty*** গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা সোচ্চারে প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সহ অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতা পেলে তবেই তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। তাই তার জীবনাচরণ ও স্বাধীনতায় রাষ্ট্রীয় শক্তি যেন হস্তক্ষেপ না করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা যেন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তার জীবনকে বিষিয়ে না তোলে। তাই মিল মনে করেন, সভ্য সমাজের সদস্য হিসাবে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবে এবং এই স্বাধীন জীবন যাপনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মোটেই কাম্য নয়। রাষ্ট্র একমাত্র তখনই ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, যখন কোন ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, অন্যথায় নয়। ***On Liberty*** গ্রন্থে মিল তাই সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others. His own good either physical or moral, is not a sufficient warrant.' প্রকৃতপক্ষে মিল ব্যক্তির নিজস্ব ভালো-মন্দ বোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে কাম্য বলে মনে করেননি। তবে, ব্যক্তির ভালো-মন্দবোধ যখন অপারপর ব্যক্তির ভালো-মন্দবোধকে ক্ষতিগ্রস্থ করে, একমাত্র তখনই রাষ্ট্র ব্যক্তির ভালো-মন্দবোধকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে।

সমষ্টিগত স্বার্থেই ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

মিল মনে করেন, ব্যক্তির আচরণ দুপ্রকারের (i) আত্মগত আচরণ বা ব্যক্তিগত (self-regarding) কাজ এবং (ii) সমাজ সংক্রান্ত আচরণ বা অন্যান্য ব্যক্তি সংক্রান্ত (Other-regarding) কাজ। ব্যক্তি যখন তার ব্যক্তিগত বা আত্মগত আচরণ করে, যা দিয়ে সে শুধু তার নিজের ভালো করতে চায়, তাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না বলে মিল মনে করেন। কিন্তু ব্যক্তির সমাজ সংক্রান্ত আচরণ যখন সমাজের অন্যান্য সকলের ভলো বা কল্যাণের পথে বাধার সৃষ্টি করে, তখন রাষ্ট্র ব্যক্তির সেই সমাজ সংক্রান্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে মিল মনে করেন। সুতরাং মিল মনে করেন, ব্যক্তির আত্মগত আচরণে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বা

ব্যক্তির ব্যক্তিগত কাজে নয়, সমাজ সংক্রান্ত কাজেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

Scanned with CamScanner

হস্তক্ষেপ কোন মতেই কাম্য নয়। কিন্তু ব্যক্তির সমাজ সংক্রান্ত বা অপরাপর ব্যক্তি সংক্রান্ত আচরণ অন্যান্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করলে সেই আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্র তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে। এইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মিল সমাজের সকল ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষার স্বার্থে কোন ব্যক্তির ক্ষতিকর ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে যথাসম্ভব ন্যূনতম করার কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, মিল শিল্প বিপ্লবের নানাবিধ জটিল সমস্যাকে উপলব্ধি করে ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতাকে নিরাপদ করে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। মিল পরিণত জীবনে দেখেছিলেন যে, শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে পুঁজিবাদ চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতাকে বিষিয়ে তুলেছে। পুঁজিবাদের পথ ধরে সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে উৎকট ধনবৈষম্য গড়ে উঠেছে। উৎকট ধনবৈষম্যের কারণে সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধনীরা যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও সাধারণ মানুষ সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিপন্ন জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শিল্প বিপ্লবের এইসব কুফলের কারণে ব্যক্তি স্বাধীনতার নিদারুণ বিপর্যয়ে মিল মানসিকভাবে আহত হয়েছেন। তাই এই বিপর্যয়ের হাত থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা এবং ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে নিরাপদ করে তোলার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর এই আহ্বানের মধ্যেই তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন।

জনজীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রের ভূমিকার সম্প্রসারণ

প্রকৃতপক্ষে, মিল শিল্প বিপ্লবোত্তর পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা, ব্যক্তির জীবনযাত্রাকে যথার্থই নিশ্চিত করে তোলা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর বাস্তব পরিস্থিতি গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীনে অর্থনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক পুনর্গঠনের কথাও বলেছেন। এইভাবে তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে বৃদ্ধি করতে চাইলেও তিনি কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করতে কোন মতেই চাননি। বরং ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই তিনি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন এবং এব্যাপারে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করার কথাই তিনি বলেছেন। ওয়েপার (Wayper) তাই বলেন, 'Mill.....urges to use the state to remove the obstacles in the way of individual's development and to make life tolerable for the masses.'

প্রকৃতপক্ষে, মিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থেই রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ক্রমসম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, সমাজের 'সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সংখ্যক সুখ' ('greatest good of the greatest number') বিধান করতে হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে রাখলে চলবে না। তিনি মনে করেন, সর্বাধিক সংখ্যকের

Scanned with CamScanner

সর্বাধিক সংখ্যক সুখ বিধান করতে হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকেও প্রসারিত করতে হবে। ব্যাপক সংখ্যকের ব্যাপক সংখ্যক সুখ বিধানের জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সকল কাজই করতে হবে। যেমনটি সমাজবাদী রাষ্ট্র করে থাকে। এদিক থেকে রাষ্ট্রকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, অর্থনীতির সুষম বণ্টন প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কাজই সম্পাদন করতে হবে। এইজন্য পরিণত জীবনের মিলকে ওয়েপার প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ সমাজবাদের সমর্থক বলে মনে করেন। ওয়েপার তো নিশ্চিন্তভাবেই বলেছেন, 'This being so, Mill shows a great deal of sympathy for socialism.'

জনজীবনের সুখ বিধানের জন্যই রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি

বস্তুতপক্ষে মিল তাঁর পরিণত জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রকে সমাজবাদী রাষ্ট্রের মতই সমাজের প্রয়োজনের উপযুক্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করার আহ্বান জানিয়েছেন। মিল মনে করতেন, আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা (Elites বা Enlightened people) এই বর্ধিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রকে সুযোগ্যভাবে পরিচালনা করবেন। আর জনগণকে আলোকপ্রাপ্ত বা উদ্দীপিত করে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। মিল তাই সমাজে সার্বিক শিক্ষা প্রবর্তনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে দিতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রকেই শিক্ষার উন্নতির স্বার্থে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে। শুধু শিক্ষার বিস্তার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সম্প্রসারণ মাত্রই নয়, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার প্রতিও রাষ্ট্র যোগ্য নজর দেবে এবং জনজীবনে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্যও রাষ্ট্র সংস্কৃতি চর্চ্চায় উৎসাহ দেবে। শুধু তাই নয়, উৎপাদন ও বণ্টনে সুষ্ঠু শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে না থেকে যদি ব্যক্তি বিশেষের হাতে থাকে, তাহলে সমাজের সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তি বিশেষের মুনাফা বৃদ্ধির কাজেই নিয়োজিত হবে, সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য নয়। মিল মনে করেন, রাষ্ট্রকে সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, যাতে ধনী-দরিদ্রের উৎকট ধনবৈষম্য দূরীভূত হয় এবং সাধারণ জনজীবন সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হয়। এইভাবে মিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির জীবনযাত্রার নিশ্চয়তার স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণ চেয়েছেন।

জনজীবনের স্বার্থে রাষ্ট্রের সম্প্রসারিত ভূমিকা

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার একনিষ্ঠ সমর্থক জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর পরিণত জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিজয়বার্তা ঘোষণা করেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। বলাই বাহুল্য যে, তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বর্ধিত করতে চাইলেও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কোন মতেই উপেক্ষা করতে চাননি। তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণের কথা বলেছেন বলে তাঁকে এক বাক্যে সমষ্টিবাদী, সমাজবাদী বা সর্বাত্মকতাবাদী (Totalitarian) বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। বরং, একথাই ঠিক যে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটিয়েও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন। এবং এইভাবেই মিল তাঁর উদারনীতিবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন।

চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সত্ত্বেও ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ

Scanned with CamScanner

মিল : রাষ্ট্র হল কল্যাণকর সংস্থা

মূল্যায়ন : প্রকৃতপক্ষে মিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ চাইলেও রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক বা সামগ্রিকতাবাদী (Totalitarian) করে তুলতে চাননি। বরং তাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণকারী উদার সংস্থায় পরিণত করতে চেয়েছেন। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বার্থে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত মিলের বক্তব্য উদারনীতিবাদকেই প্রতিফলিত করে। কারণ, উদারনীতিবাদের লক্ষ্যই হল এমন এক সমাজ গড়ে তোলা, যে সমাজ হল স্বাধীন, দায়িত্বশীল ও আইন মান্যকারী জনগণের সমাজ এবং যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণ সকল প্রকার দারিদ্র্য, দাসত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে, যেখানে সকলেই সুস্থ দেহ ও সুশিক্ষিত মনের অধিকারী এবং সেখানে সকলেই নিজেদের সত্তার সর্বোত্তম বিকাশের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী। বলাই বাহুল্য, মিল এই ধরনের উদারনীতিবাদী সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যেখানে রাষ্ট্রই সমাজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে জনজীবনকে সুস্থ, সুদৃঢ়, নিরাপদ ও নিশ্চিত করে তুলবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে করে তুলবে যথার্থ অর্থবহ ও সুরক্ষিত।

ব্যক্তির সুস্থতার স্বার্থে রাষ্ট্রের মহিমান্বিত ভূমিকা

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মিলের বর্ণিত রাষ্ট্র কোন মতেই সর্বাত্মক বা সামগ্রিকতাবাদী রাষ্ট্র নয়, বরং তা জনকল্যাণকর উদারনৈতিক রাষ্ট্র। মূলতঃ শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সমাজে মানুষে মানুষে যে উৎকট ধনবৈষম্য গড়ে উঠেছিল এবং এর ফলে সাধারণ জনজীবনে যে হতাশা ও বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তাতে মিল যারপরনাই হতাশ হন। এবং এমত অবস্থায় জনজীবনকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে একান্তভাবে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রকে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বা কার্য সম্পাদনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মূল লক্ষ্যই হল, মিলের মতে, জনজীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা এবং নাগরিকগণেরও কর্তব্য হল রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণমূলক কাজের তথা উপযোগিতার মানদণ্ডে রাষ্ট্রকে বিচার করে দেখা। উপযোগিতার মানদণ্ডে রাষ্ট্র উত্তীর্ণ হলে নাগরিকগণের কর্তব্য হল সেই রাষ্ট্রকে গ্রহণ করা ও মান্য করা। তাই মিল নাগরিকগণকেও শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে দায়িত্বশীল হয়ে ওঠার কথা বলেছেন।

মন্তব্য : সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মিল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম লগ্নে একেবারে

Scanned with CamScanner